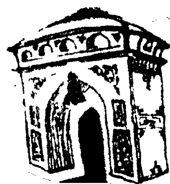


ঘন্টিঘটকে

প্রশান্ত চৌধুরী





নর্দার্ন বুক ক্লাব

প্রথম সংস্করণ : ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৩

প্রকাশক :

সি, এল, দাস

নর্দার্ণ বুক ক্লাব

৬৭বি আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৫

মুদ্রাকর :

সুবোধচন্দ্র মণ্ডল

কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ

৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,

কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট : প্রশান্ত চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

মোহন প্রেস

দাম : দু'টাকা বার আনা।

Himalaya Stores Ltd. Rs 2/12/-

পিতৃদেব

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পরমপূজনীয়েষু

ছ'বছর আগে গল্পাকারে 'ঘণ্টাফটক' প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিকপত্রের পাতায়। তারপর দেওয়া হয় এর নাট্যরূপ। 'ঘণ্টাফটক' নাটক কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে প্রথম অভিনীত হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে। গ্রন্থকারের স্বভাবসিদ্ধ আল্‌সেমির জন্যই উপন্যাস প্রকাশে এই অবাঞ্ছিত বিলম্ব।

বৈশাখ ১৩৬৩ —প্রকাশক

ভুবনপুরের সদর-সড়কের চৌমাথায় রায়েদের বিরাট ঘণ্টাফটকের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো ঢং ঢং কোরে। রাত নটা বাজলো।

রায়বাড়ীর খাস্‌-মহলের শয়নকক্ষে পংখের কাজ-করা ঘরে মেহগ্‌নির পালংকে শুয়ে ছিলেন হৈমবতী দেবী। শুধু এই শুয়ে থাকা, আর নরহরি কবিরাজের ওষুধ খাওয়া :—আজ চার বছর ধরে এ ছাড়া আর তো কিছুই করবার নেই তাঁর।

একমাত্র সন্তান বালক দর্পনারায়ণ মার কাছে ব্যাঙমা ব্যাঙমীর গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে পাশে শুয়ে। পালংকের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল প্রসন্ন দাসী বিষ্ণুপুরী-হাতপাখায়। ঘণ্টাফটকের ঘণ্টা শুনে হৈমবতী ফিরে তাকালেন দাসীর দিকে।

: রাত নটা বাজলো, না রে প্রসন্ন ?

: হ্যাঁ মা।

: হরিপদ এসে কই নিয়ে গেল না দর্পকে এখনো ? রুগীর বিছানায় ছেলেটা কতক্ষণ শুয়ে থাকবে ?

বলতে বলতেই ভৃত্য হরিপদ এসে ঢোকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতপাখাটি নামিয়ে রেখে প্রসন্ন দাসী চলে যায় নরহরি কবিরাজের ওষুধটা মধু দিয়ে খলে মাড়তে।

অবসন্ন চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন হৈমবতী। একটা বুঝি দীর্ঘশ্বাস ঠেলে উঠতে চায় বুকের ভেতর থেকে;—মুখে এক টুক্‌রো ম্লান হাসি এনে সেটাকে ঢাকা দেন তিনি।

হরিপদ তার শক্ত সবল কালো ছুটো হাতে বালক দর্পনারায়ণের নরম কচি দুধের মতন সাদা ধব্‌ধবে ঘুমন্ত দেহটাকে তুলে নিয়ে চলে যায় পাশের ঘরে। প্রসন্ন দাসী ওষুধের খল নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

: মাগো, ওষুধটা।

যন্ত্রচালিতের মতো হৈমবতীর হাতটা উঠে আসে ওষুধের খল্‌এর দিকে। যন্ত্রচালিতের মতো হাতটা আসে মুখের কাছে। ওষুধ খেয়ে শাড়ীর আঁচলে মুখ মোছেন হৈমবতী। প্রসন্ন দাসী আবার বাতাস করতে থাকে। বিষ্ণুপুরী হাতপাখার ঝালরে কী একটা আতর লাগানো; বোধ হয় খস্‌। তার গন্ধে ঘরের বাতাস মন্থর হয়ে ওঠে!

অবসন্ন চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হৈমবতীর বুকের ভেতরটায় কিসের যেন তোলপাড় হয়। নিঃশ্বাসটা একটু যেন ঘন ঘন পড়তে থাকে, চোখের কোলে একটু যেন জল।

শিয়রের জানলাটা দিয়ে দিনের বেলায় দেখা যায় দূরের ঘণ্টাফটককে। রাত্রে সব অন্ধকার।

ভুবনপুরের সদর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট ঘণ্টাফটক রায়েদের ঐশ্বর্য্য আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির নীরব সাক্ষী হয়ে। লোহার শেকলে বাঁধা অষ্টধাতুর প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝোলানো আছে ফটকের কারুকার্য্য-করা খিলেনের মাঝখানে। ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনে ভুবনপুরের টোলের পাঠ সুরু হয়, কাছারির কাজ বসে। ঐ ঘণ্টার

শব্দ শুনে মনে মনে মধুরজনীর প্রহর গণে ভুবনপুরের নব-দম্পতি, রুগ্ন পুত্রের শিয়রে বসে কালরাত্রির আয়ু গণনা করেন উৎকণ্ঠিতা জননী।

চারপুরুষ আগেকার কথা।

ভুবনপুরের রায়েদের রাজা হওয়ার ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় নাম আছে যাঁর, তাঁর নাম ছিল দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়। কেমন কোরে অখ্যাত এই ভূস্বামী ভুবনপুরের রাজা হয়ে উঠেছিলেন, সে কাহিনীর সবখানি জানা নেই এখন আর কারোর। শুধু জানা আছে, কেমন করে বুঝি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাদারল্যাণ্ড সাহেবের নেক্‌নজরে পড়েছিলেন দেবেন্দ্রনারায়ণ। রাজা খেতাব্‌টা তিনিই দিয়েছিলেন আনিয়ে। আর জানা আছে, —ভুবনপুরের রায়বংশের প্রথম রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে রাজা খেতাব পেয়ে গড়েছিলেন দুটি বিরাট প্রাসাদ ;—খাস্‌মহল আর বাঈমহল। আর গড়েছিলেন ভুবনপুরের সদর-সড়কের চৌমাথায় রায়েদের আভিজাত্যের প্রতীক এই বিরাট ঘণ্টাফটক।

ঘণ্টাফটকের তলা দিয়ে যে চওড়া রাস্তাটা সোজা উত্তরমুখো এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দু-দিকে ভাগ হয়ে বেঁকে গেছে,—তারই এক ভাগের প্রান্তে খাস্‌মহল, অন্য প্রান্তে বাঈমহল।

খাস্‌মহল রায়েদের সংসার। বাঈমহল তাঁদের প্রমোদ-ভবন।

ভুবনপুরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনারায়ণের নির্দ্দেশে ঐ ঘণ্টাফটকে প্রথমে ঘণ্টা বেজেছিল যেদিন, সেদিনটি ছিল বারোই কার্ত্তিক। সেদিন ঐ ঘণ্টাফটকের তলা দিয়ে হাতীর পিঠে কিংখাবের

হাওদায় সুদূর জয়পুর থেকে ভুবনপুরে এসেছিল বাঈমহলের প্রথম বাঈ মুন্নিবাঈ জয়পুরী।

ভুবনপুর রাজবংশের প্রথমা রাণী মহামায়া দেবী তার অনেক আগেই মারা গেছেন। খাস্‌মহল, বাঈমহল বা ঘণ্টাফটক কোনটাই দেখে যাননি তিনি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গড়ে উঠেছিল সব। স্বর্গীয়া মহামায়া দেবী রেখে গিয়েছিলেন শুধু একটি মাত্র বালক পুত্রকে। খাস্‌মহলের জাফরি দেওয়া গম্বুজ-ঘরে দাসীর কোলে বসে সেই মাতৃহীন বালক পুত্র বাঈমহলের প্রতিষ্ঠা-উৎসবের বিপুল সমারোহ দেখে দাসীকে শুধিয়েছিল,—ও-বাড়ীতে কি হচ্ছে পদ্মদাসী? আঁচলে চোখমুছে উঠে গিয়েছিল পদ্মদাসী খোকাকে বুকে নিয়ে।

বাঈমহলের দিকে তাকিয়ে খাস্‌মহলের চোখের জল শুকোতে আরো এক পুরুষ লেগেছিল। তারপর কখন এক সময় সয়ে গেল সব। একটি পাখীর দুটি ডানার মত এই দুই মহল হয়ে উঠল ভুবন-পুরের রায়বংশের অপরিহার্য্য দুই অঙ্গ।

খাস্‌মহল আর বাঈমহল,—দুই মহলই সমান দায়িত্বে চালিয়ে গেলেন ভুবনপুরের রায়েরা পুরুষানুক্রমে। খাস্‌মহলের ঠাকুরবাড়ীর উঠোনে দুর্গোৎসবের আয়োজনে যেমন তাঁদের উৎসাহ,—বাঈমহলের নাচঘরে জলসার আসরেও তাঁদের তেমনি স্ফূর্ত্তি। কোনো মহলের কর্ত্তব্যেই এতটুকু শৈথিল্য নেই রায়েদের।

খাসমহলের দক্ষিণের হলঘরের দেয়ালে টাঙানো রইল রায়বংশের রাজাদের ছবির পাশে পাশে গিল্টির নক্সা-করা চওড়া ফ্রেমে

বাঁধানো খাস্‌মহলের রাণীদের তৈলচিত্র। বাঈমহলের নাচঘরের দেয়ালে ঝোলানো রইল রায়বংশের মালিকদের ছবির পাশে পাশে বাঈমহলের মালিকান্‌দের অয়েল্‌পেন্টিং। খাস্‌মহলের রাণীরা রায়েদের দিলেন সংসার, দিলেন সেবা ; বাঈমহলের মালিকানরা রায়েদের দিলেন সুর, দিলেন ছন্দ। দু-মহলের টানা-পোড়েন বিরোধ বাধালে না রায়েদেব জীবনে।

একটি পাখীর দুটি ডানার মতো এই দুটি মহলের ভেতরে ভেতরে কিন্তু পুরুষানুক্রমে কোথায় জমে ওঠে ব্যথা !

এক মহল তার নূপুর নিক্কনের উচ্ছলতা আর সারেঙ্গীর মাদকতায় ভরে গিয়েও কেবলই টের পায়, কোথায় যেন তার ক্ষুদ্রতার দৈন্য, কোথায় যেন তার অপরিসীম লজ্জা, কোথায় যেন সে অপরাধী হয়ে আছে সবার কাছে। আব এক মহল তার আভিজাত্য, তার সম্মান, তার মর্য্যাদা, তার সকল সামাজিক গৌরব নিয়েও ভাবে, বুকের কোন্‌খানটায় যেন অনেকখানি ফাঁক রয়ে গেল !

রায়বংশের বর্ত্তমান রাণী হৈমবতী রোগশয্যায় চুপচাপ শুয়ে ভাবছিলেন নিজের জীবনের কথা। জীবনে অর্থ, সম্মান, সংসার সব কিছুই পেয়েছেন। স্বামী ?—পেয়েছেন বৈকি তাঁকেও। স্বামীর কাছ থেকে এতটুকু অমর্য্যাদা হয়নি তাঁর কোনদিন। পুজোয় গ্রামের দরিদ্রা সধবাদের সাড়ী-সিঁদুর বিলোবেন,—চেয়েছেন পঞ্চাশ, এসেছে আড়াইশো শাড়ী। রাধাগোবিন্দর দোলযাত্রার দিন ধুতি-উড়ুনি দান করবেন ব্রাহ্মণকে,—মুখের কথাটি সরবার আগেই এসে পৌঁছেচে দুশো জোড়া ধুতি-উড়ুনি। জলদান-ব্রত করবেন,—কথাটা

তুলতে না তুলতেই প্রকাণ্ড দীঘি কাটিয়ে দিয়েছেন অনন্তনারায়ণ রায়। তবু, তবু যেন বুকের কোন্খানটায় ফাঁকা ফাঁকা লাগে!

অসুস্থ হয়ে রোগশয্যায় শুয়ে আছেন তিনি আজ চার বছর। এই চার বছরে সমস্ত সংসারটা একটু একটু কোরে যেন দূরে সরে যাচ্ছে তাঁর কাছ থেকে। বেশ টের পাচ্ছেন, এ-সংসারে তাঁর প্রয়োজন যেন কমে আসছে ক্রমেই।

আজ চার বছর এই রোগশয্যায় শুয়ে তিনি বেশ অনুভব করছেন, সংসারটা চলছে যেন প্রাণহীন একটা যন্ত্রের মতো সময় মেপে মেপে।

সকালবেলা ঘণ্টাফটকের ঘণ্টায় যখন আটটা বাজে, রায়েদের গাড়ী-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ায় হাঙর-মুখো পাল্কী। কাছারিতে চলে যান অনন্তনারায়ণ। দ্বিপ্রহরে নিয়মিত ফিরে এসে ভোজনে বসেন অসুস্থা রাণী হৈমবতীর কক্ষে। কিছু বিশ্রাম। লক্ষ্ণৌয়ের রূপো-বাঁধানো আল্‌বোলায় একটু গাজীপুরী তামাকের ধোঁয়া। অলস মধ্যাহ্ন। মন্থর অপরাহ্ন। তারপর ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা। বেজে ওঠে অষ্টভূজার মন্দিরে আরতির ঘণ্টা। অনন্তনারায়ণ করজোড়ে দাঁড়ান গিয়ে মন্দিরের চাতালে। তারপর?—ঘণ্টাফটকের ঘণ্টায় যখন ঢং—ঢং কোরে সন্ধ্যা সাতটা বাজে, খাস্‌মহলের ঘোড়া তার রাজাকে পিঠে নিয়ে পৌঁছে দেয় বাঈমহলের নাচঘরে। তিন ঘণ্টার জন্য সেখানে বেজে ওঠে সারেঙ্গী, নেচে ওঠে নূপুর, দুলে ওঠে মন। রাজাকে নিয়ে বাঈমহল থেকে ঘোড়া ফিরে আসে আবার ঠিক রাত দশটায়।···

রোগশয্যায় শুয়ে ভাবছিলেন হৈমবতী। প্রসন্ন দাসী বাতাস করছিল। রাণী হৈমবতী দুর্বল কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন: তোরা সবাই যন্তর হয়ে গেছিস, না রে প্রসন্ন?

কথাটার মানে প্রসন্নদাসীর বোঝার কথা নয়। তাই সে চুপ কোরেই থাকে। হৈমবতী আবার বলেন: ঘণ্টাফটকের ঘড়ি ধরে তোদের যত কাজ, সে কি একদিনও ভুল হবে না?—ঘণ্টা-ফটকের ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা বাজবে, খাস্‌মহলের ঘোড়া অমনি তার রাজাকে পিঠে করে পৌঁছে দেবে বাঈমহলে।···আটটা বাজবে, অমনি ঠিক বামুনবৌ আসবে দুধের বাটি নিয়ে আমার কাছে।······নটা বাজবে, হরিপদ ঠিক এসে তুলে নিয়ে যাবে খোকাকে।···তার পরেই তুই এসে দাঁড়াবি ওষুধের খল নিয়ে!···তারপরি সেই যখন দশটা বাজবে রাত, ফিরে আসবে তখন খাস্‌মহলের ঘোড়া বাঈমহল থেকে তার রাজাকে পিঠে নিয়ে। ওরে, তোদের এই ঘড়ি-ধরা কাজের কি কোনদিন ভুল হবে না?—এলোমেলো হবে না?—আগুপিছু হবে না?

হৈমবতী একান্ত ভাবে চান, একটু ভুল হোক্। একদিন ভুলে যাক্ প্রসন্ন ওষুধ দিতে, ভুলে যাক্ বামুন-বৌ সময় মতো দুধ খাওয়াতে! আর······যাক্ না ভুলে খাস্‌মহলের ঘোড়া তার রাজাকে পিঠে কোরে বাঈমহলে পৌঁছে দিতে? কিংবা, রাত দশটা বাজবার অনেক আগেই হঠাৎ একদিন আসুক না ঘোড়া ফিরে! বাঈমহলের সারেঙ্গী থামুক না একদিন সকাল-সকাল।

বাঈমহলের সারেঙ্গী থেমেছে কিছুক্ষণ হল। বাঈমহলের মালিকান পিয়ারাবাঈ জয়পুরী আর খাস্‌মহলের রাজা অনন্তনারায়ণ এসে দাঁড়িয়েছেন নাচঘরের সামনের জাফরিকাটা ঝুল্‌-বারান্দায়। নিচের বাগানে দাঁড়িয়ে খাস্‌মহলের ঘোড়া পা ঠুক্‌ছে। অনন্তনারায়ণ একটি মুক্তার সাতনরী পরিয়ে দিলেন পিয়ারাবাঈএর কণ্ঠে।

পুরুষানুক্রমে খাসমহলের মালিকও যেমন বদলেছে,—বাঈমহলের মালিকানও বদলেছে তেমনি। মুন্নিবাঈ সময় থাকতেই আনিয়েছিল তার বোনের মেয়ে লছমীকে। লছমীর পর এল জীর্দন। জীর্দন আনিয়েছিল তার পিসির মেয়ে পিয়ারাকে অনেক অল্প বয়েসেই। সেই পিয়ারাই এখন বাঈমহলের চতুর্থা মালিকান্‌ পিয়ারাবাঈ জয়পুরী।

মুক্তার সাতনরী পেয়ে পিয়ারাবাঈ কুর্ণিশ করে বললে: এ কেন?

অনন্তনারায়ণ আনন্দোজ্জ্বল মুখে বললেন: বড়বৌ আজ একটু ভাল আছেন পিয়ারা।

রাণী হৈমবতীর বুকের যন্ত্রণাটা আজ সকাল থেকে একেবারেই নেই,—এখবরটা পেয়ে কী যে করবেন ভেবেই পাননি অনন্তনারায়ণ সারাদিন। তিনজন প্রজার অনেকখানি দেনা মাফ করে দিয়েছেন সকালে; সহিসটাকে দান করে দিয়েছেন চেন্‌ সমেত ঘড়িটা, স্তায়রত্নের টোলে রাণীর নামে দিয়েছেন মোটা টাকার বৃত্তি,—তবু মন ভরেনি। মাণিকলাল জহুরী এসেছিল কাছারিবাড়ীতে নতুন কতকগুলো জড়োয়া গহনা দেখাতে,—মুক্তার সাতনরীখানা তুলে না

নিয়ে থাকতে পারেন নি অনন্তনারায়ণ। রাত্রের অস্পষ্ট আলোকে পিয়ারাবাঈ এর কণ্ঠে সেই সাতনরীটি পরিয়ে দিয়ে আজকের এই শুভদিনটি উদ্‌যাপন করলেন যেন তিনি।

: ভাল আছেন রাণী!—আনন্দে চক্ চক্ করে উঠল পিয়ারা বাঈএর শুর্মা-টানা চোখদুটি : কবিরাজ মশাই কি বলছেন? একেবারে সেরে উঠতে তাঁর আর কতদিন লাগবে?

বাঈমহলের মালিকানের অন্তরের একান্ত কামনা, তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন খাস্‌মহলের রাণী। খাস্‌মহলের রাজার আজকের এই আনন্দ স্থায়ী হোক চিরদিন।

ঘণ্টাফটকের ঘণ্টায় দশটা বেজে ওঠে ঢং ঢং জোরে। নিচের বাগানে দাঁড়িয়ে খাস্‌মহলের ঘোড়া পা ঠুকে ডেকে ওঠে : চিঁহিহি।

বাঈমহল ছেড়ে রাজাকে খাসমহলে ফিরতে হবে এবার।

তখন বিকেল। গা ধুয়ে চুলবাঁধা শেষ কোরে পিয়ারাবাঈ এসে দাঁড়িয়েছেন বাঈমহলের ঝুল্-বারান্দায়। এখান থেকে একটু দেখা যায় খাস্‌মহলের পূব্-ঘরের জানলাটা। ঐ ঘরেই রোগশয্যায় শুয়ে আছেন রাণী হৈমবতী। হয়তো প্রসন্ন দাসী তাঁর মেঘের মতো কালোচুলের সামনের দিকে একটু চিরুণী বুলিয়ে এতক্ষণে সিঁদুর কৌটো এনে দিয়েছে তাঁর হাতে, সামনে ধরেছে রূপো-বাঁধানো আর্সি। হয়তো এতক্ষণে রাণী তাঁর সিঁথেয় টেনে দিয়েছেন এয়োতীর রাঙা রেখা, রোগতপ্ত ললাটের মাঝখানে দিয়েছেন এঁকে একটি উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু।

পশ্চিম আকাশে সূর্য্যদেবকেও দেখাচ্ছে যেন আকাশের ললাটে রাঙা সিঁদুরের টিপ্-এর মতোই!

পিয়ারাবাঈ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কুঞ্চিত কেশের সিন্দুর-বিহীন সিঁথির ওপর জড়োয়া টিক্‌লিটা আরো ভালো কোরে ঢাকা দেন! তারপর নিচের বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখেন, রত্না পাথরের চবুতরের ওপর বোসে দর্পকে আম্‌লকির আচার খাওয়াচ্ছে।

বাঈমহলের মেয়ে রত্না। খাস্‌মহলেব কুমার দর্পনারায়ণের চেয়ে বছর চারেকের ছোটই হবে। বয়েস আট। এই রত্নাই একদিন হবে এই বাঈমহলের পঞ্চমা মালিকান্ রতনবাঈ জয়পুরী। হবে বোলেই তো পিয়ারাবাঈ জয়পুর থেকে তাঁর ভাই-এর এই মা-হারা মেয়েটিকে নিজের কাছে বাংলাদেশে এনে রেখেছেন। বাঈমহলের আদব্-কায়দায় তাকে দোরস্ত্ কোরে তুলতে হবে তো এখন থেকেই।

ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিয়ারাবাঈ-এর মনটা কোথায় যেন দূরে

ভেসে ভেসে যেতে চাইছিল আজ কেবলই।...অনেকদিন আগে ফেলে-আসা রাজপুতানার মরুভূমির উদাস-করুণতা, নিঃসঙ্গ উটের নিঃশব্দ-ক্রন্দন, ময়ূরের কেকা, কোন্ জায়গীরদারের ভাঙ্গা একটি ফটক।...কেমন যেন মন-কেমন করে ওঠে। মনটাকে কেবলই কেন যেন দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অতীতের স্মৃতি। পিঠের ওপর কার হাতের ছোঁয়া লাগতেই মনটা ফিরে এল: ওমা, তুমি! এমন অসময়ে? সন্ধ্যে সাতটা বাজতে যে এখনও অনেক দেরী।

অনন্তনারায়ণ হেসে বললেন: হঠাৎ মনে পড়লো, এবারের ১২ই কার্ত্তিকের উৎসবের কী ব্যবস্থা করছো?

: তাই এমন অসময়ে চলে এলে?

: হ্যাঁ পিয়ারা।

বায়েদেব ঐ ঘণ্টাফটকে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের আমলে প্রথম ঘণ্টা বেজেছিল যেদিন, যেদিন এই বাঈমহলের প্রথমা মালিকান মুন্নিবাঈ জয়পুরী এসেছিল এই বাঈমহলে, সেদিনটা ছিল ১২ই কার্ত্তিক। তিনপুরুষ ধোরে বাঈমহলে তাই উৎসব হয়ে আসছে ১২ই কার্ত্তিকের। অনন্তনারায়ণের আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি কোনো বারেই।

: কিন্তু ১২ই কার্ত্তিকের তো এখনও অনেক দেরী।

পিয়ারাবাঈ অনন্তনারায়ণের ব্যস্ততা দেখে হেসে ওঠেন।

: অনেক দেরী?

মুষড়ে পড়েন যেন অনন্তনারায়ণ: আমার যেন হঠাৎ কেমন মনে হল, আর বেশি দিন নেই হাতে। আজই তো মিশিরজীকে বোলে দিলুম ভাল একজন সারেঙ্গীদার আনাতে পশ্চিম থেকে। যাই হোক্,

অসময়ে এসেই যখন পড়েছি, তখন এসো ১২ই কার্ত্তিকের জল্‌সার ফর্দ্দটা কোরে ফেলি আজই।

বড় ভয় পিয়ারার, তার আকর্ষণে অনন্তনারায়ণ পাছে কোনোদিন খাস্‌মহলের কর্ত্তব্যে অবহেলা করে বসেন। তাহলে সে যে বড় লজ্জার কথা হবে,—ভুবনপুরের বড় কলঙ্কের কথা। আজকে এমন অসময়ে অনন্তনারায়ণকে বাঈমহলে আসতে দেখে তাই শঙ্কায় ভরে উঠেছে পিয়ারাবাঈ-এর মন। ভুবনপুরের রায়ের জীবনে এ-অসংযম কেন?

দূরের খাস্‌মহলের সেই পুব-ঘরের জানলার খড়খড়িটা বন্ধ হয়ে যায় ইতিমধ্যে। হয়তো ঠাণ্ডা হাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে হৈমবতীর। সেইদিকে তাকিয়ে থেকে পিয়ারাবাঈ শান্ত কণ্ঠে বলেন: কিন্তু ১২ই কার্ত্তিকেরও আগে সামনেই আসছে খাস্‌মহলের দুর্গোৎসব। তার কি করছ?

ম্লান হাসেন অনন্তনারায়ণ: খাস্‌মহলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ কোরে দিচ্ছ পিয়ারা?

অপ্রস্তুতে পড়ে যান পিয়ারাবাঈ। আম্‌তা আম্‌তা করেন: না না, এমনি হঠাৎ···

: খাস্‌মহলের কর্ত্তব্যের কথা ভুল আমার হয় না পিয়ারা কোনোদিন। মনে থাকে সবই।

স্থির কণ্ঠ অনন্তনারায়ণের।

পিয়ারাবাঈ বুঝতে পারেন, না বুঝে কোথায় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছেন তিনি। হেসে বলেন: ও কথা থাক্।

কিন্তু থাক্ বললেই তো কথা থামে না। অনন্তনারায়ণ বলতে থাকেন: খাস্‌মহলের রাণীর আসনে যিনি বসে আছেন, তাঁকে বুঝতে

পারি না পিয়ারা। কত কাছে থেকেও কত দূরে যে তিনি থাকেন! তাঁর নাগাল মেলেনা। তাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করা যায়, কাছে থেকে ভালবাসা যায় না।

পিয়ারাবাঈ আবার বাধা দেন : এসো ভেতরে এসো।

অনন্তনারায়ণ তেমনি বলে চলেন : সামনেই দুর্গোৎসব,—খাস্‌মহলের সবচেয়ে বড় উৎসব। খাস্‌মহলের রাণীর কাছ থেকে যদি বায়না আসতো,—'কলকাতা, থেকে ভাল যাত্রাগানের দল আনানো চাই, কিংবা শ্রীখণ্ডের কবিগান',—আমি ছুটে যেতাম পিয়ারা, নিজে গিয়ে আনন্দ কোরে ডেকে নিয়ে আসতাম তাদের। খাস্‌মহলের রাণী আব্‌দারও করেন না, হুকুমও করেন্ না।—তাই তো ছুটে ছুটে তোমার কাছে আসি অসময়েও। পিয়ারা, তুমিও এমন কোরে আমাকে নিরুৎসাহ কোরো না। একটা কিছুর বায়না করো, একটা কিছুর আব্দার করো, নৈলে আমি যে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি।

: ক্ষমা করো আমাকে।

পিয়ারার কথাগুলো যেন লজ্জায় অনেক দূর থেকে ভেসে আসে।

১২ই কার্ত্তিকের সকাল। পত্রঘন বনস্পতির তলায় ছোট্ট চারাগাছটি যেমন তার ছোট্ট ছায়াখানিকে নিয়ে খেলা করে বনস্পতির অনুকরণ কোরে, তেমনি বাঈমহলের বাগানের জলটুঙ্গী-ঘরে দর্প আর রত্না মেতেছে জল্‌সা জল্‌সা খেলায়।

বাঈমহলের সরকারমশাই প্রৌঢ় গঙ্গাপ্রসাদবাবু রাজী হয়েছেন মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে এই খেলাঘরের জল্‌সার ওস্তাদী গানের গায়ক হতে। রুমাল একটা জোগাড় করেছে দর্প। আর দুপুরে মায়ের কাছ থেকে রূপোর টাকাও জোগাড় কোরে নেবে সে ঠিক। সন্ধ্যেয় যখন জল্‌সা হবে,—সরকারমশাই গান ধরবেন,—তখন বারকতক কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ বোলে রুমালে-বাঁধা টাকা দিতে হবে তো তাঁকে! বাঃ, তা' নৈলে আর জল্‌সা হল কি?

পান মুখে দিতে হবে আজ রত্নাকে, আর মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে দর্পকেও এগিয়ে দিতে হবে একটা-দুটো জল্‌সার সময়। একদিন লাগবেই নাহয় দাঁতে পানের ছোপ. ;—তারপরে মুখ ধুয়ে ফেললেই আর টের পাচ্ছে কে?

কিন্তু হরিপদ যে কখন এসে পেছন থেকে টপ্‌ কোরে কোলে তুলে নিয়েছে দর্পকে, তা' সে টেরই পায়নি একদম্।—দর্প হাত-পা ছুঁড়ে বলে: এখনও আমাদের ঘর সাজানো হয়নি যে! ছাড়্‌ না হরিপদদা।

হরিপদ দর্পকে আরো আঁকড়ে ধোরে বলে: ক্ষীরি বুড়ি যে ওদিকে সর-ময়দা নিয়ে বোসে আছে গায়ে মাখাবে বোলে। এখন থেকে মাখতে না বসলে চান করতে যে দুপুর হয়ে যাবে। সে খেয়াল আছে?

দর্প হাত-পা ছোঁড়ে আর চেঁচায় পরিত্রাহি। কিন্তু হরিপদর তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই।

১২ই কার্ত্তিকের বিকেল। বাঈমহলের উৎসবের সবকিছুর তদারক শেষ কোরে পিয়ারাবাঈ এসে দাঁড়িয়েছেন ঝুল-বারান্দায়। কপালে স্বেদবিন্দু। চূর্ণ চুল উড়ে এসে পড়ছে সেই স্বেদ বিন্দুর ওপর। একটু পরেই সূর্য্যাস্ত হবে। জ্বলে উঠবে বাঈমহলের রঙীন্ কাট্‌গ্লাসের সব কটা ঝাড়-লণ্ঠন। আগাগোড়া জড়োয়া গহনায় মুড়ে পিয়ারাবাঈকে হাজির থাকতে হবে জল্‌সায়। বড় বড় সব গুণী ওস্তাদ এসেছেন নানা জায়গা থেকে। বিষ্ণুপুরের বৈরাগী পাখোয়াজীর মৃদঙ্গের সঙ্গে নতুন একটা গান শোনাবেন পিয়ারাবাঈ আজ সেই গুণীজনসভায়। সারাদিনের কর্ম্মব্যস্ততার পর একটু জিরিয়ে নিতে এসেছেন তিনি এই ঝুল-বারান্দায়। হঠাৎ চোখ পড়ে যায় খাস্‌মহলের পূব্‌ঘরের জানালার দিকে। কে জানে কেমন আছেন রাণী হৈমবতী!

দাসী এসে ডাকে হাতীর দাঁতের চিরুণী নিয়ে: চুল বাঁধবে না মা?

১২ই কার্ত্তিকের সন্ধ্যা। খাস্‌মহলের পূব্‌-ঘরে এইমাত্র প্রসন্ন এসে রেখে গেল সেজের আলো। শাঁখ বাজালো। বামুনবৌ এসে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ধুনো দিয়ে গেল।

হৈমবতী শুয়ে ছিলেন পালংকে। মাথার কাছে বোসে দর্প রামায়ণ পাঠ কোরে শোনাচ্ছিল মাকে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজতেই মায়ের দেখাদেখি দুহাত তুলে নমস্কার জানালে। তারপর বললে: আবার পড়ছি মা।

: থাক্ বাবা, অনেকক্ষণ পড়েছ, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

দর্প বলে : না মা, একটুও কষ্ট হচ্ছে না আমার। তুমি চুপটি কোরে চোখ বুজে শোনো,—আমি আবার পড়ছি।

সন্ধ্যার এই সময়টিতে কেমন যেন মন-কেমন করে হৈমবতীর। মনে হয় কি যেন হারিয়ে যাচ্ছে। রোদের আলো গাছের সঙ্গে মাঠের সঙ্গে নদীর সঙ্গে কতো খেলা কোরে এই মাত্র যেমন কোরে বিদায় নিলে,—হৈমবতীর মনে হয়, এই সংসারের মানুষের সঙ্গে তেমনি অনেক খেলা করবার পর তাঁরও অমনি বিদায় নেবার সময় এসে গেছে। সন্ধ্যার শাঁখ যেন কতদূরের আহ্বান আনে,—ধুনোর ধোঁয়া যেন কাছের জিনিষকে কেবলই অস্পষ্টতর কোরে তুলতে চায়।

হৈমবতী ডাকেন : খোকা ?

: কি মা ? কষ্ট হচ্ছে ? বাতাস করবো ?

: না রে,—বাতাস নয়,—কাছে আয়।

: কি বলছো মা ?

দর্প মায়ের কোলের কাছে এসে বসে। তাকে জড়িয়ে ধোরে হৈমবতী বলেন : ধর আমি যদি চলে যাই এখান থেকে অনেক দূরে ?

: কোথায় যাবে মা ? কাশীতে ? বাবা বলছিলেন, তোমার শরীর ভাল হলে আমরা সবাই কাশীতে যাবো বেড়াতে। সেখানে আমাদের একটা বাড়ী আছে,—না মা ?

: কাশীতে নয় বাবা,—আরো দূরে !—বলতে বলতে কান্নায় গলা বুজে আসে হৈমবতীর। বলেন : সেই অনেক দূরে আমি যদি চলে যাই একা ? তোর—

দর্প হেসে বলে: পাল্কীতে যাবে তো? আমি লুকিয়ে টুক্ কোরে গিয়ে বসে থাকবো পাল্কীতে আগে ভাগে।—তখন?

হু হু কোরে জল নেমে আসে হৈমবতীর চোখে।

ওদিকে জলটুঙ্গী ঘরে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছে রম্ভা। দর্পটা যেন কী। সন্ধ্যে হয়ে গেল,—কখন্ আর হবে জল্সা-জল্সা খেলা? সত্যি, এমন রাগ ধরে!

বাগানের বুড়ো মালীর হাত চেপে ধরে রম্ভা: ও সনাতনদা, নিয়ে চলো না আমাকে একবার খাস্‌মহলে। দেখি দর্পটা কি করছে?

খাস্‌মহলের অন্দরে উঠে আসে রম্ভা তর্‌তর কোরে। তারপর পুব্-ঘরের বারান্দার কাছে এসেই থমকে দাঁড়ায়। আর যাবার হুকুম নেই তার। কেন নেই, তা' সে আজো বুঝতে পারে না। ঐখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পায় রম্ভা, পুব্-ঘরের পালংকে শুয়ে আদর খাচ্ছে দর্প রাণীমার কাছে। চেঁচিয়ে ডেকে ওঠে: দর্প, দর্প, সন্ধ্যে হয়ে গেল যে! কখন্ হবে আমাদের জল্সা জল্সা খেল?

দর্প তাড়াতাড়ি উঠে বোসে চেঁচিয়ে বলে: আজ আর জল্সা হবেনা রম্ভা। আমি মার কাছে থাকবো কি না। মার আজ কষ্ট হচ্ছে তো। আমাদের জল্সা কাল হবে,—য়্যাঁ?

: কিন্তু সরকার মশায়ের মাথায় পাগড়ী বাঁধা হয়ে গেছে যে!

ভারী মুস্কিলের কথা! সরকার মশায়ের মাথায় পাগড়ী বাঁধার মতো অতবড় একটা মস্তো হাঙ্গামার কাজই যখন সমাধা হয়ে গেছে, তখন জল্সাটাকে কি কোরে আর কাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা যায়?

অত কষ্টের মধ্যেও হাসি আসে হৈমবতীর মুখে মেয়েটার কথা শুনে। সস্নেহে বলেন : দর্প, মেয়েটাকে কাছে ডাক্।

চমকে ওঠে দর্প ! মার হ'ল কি আজ? রত্নার তো বারান্দা পেরিয়ে এঘরে ঢোকবার হুকুম নেই কোন দিনই। দর্প মনে করিয়ে দেয় : ওযে রত্না মা ! কাছে আসবে?

: আসবে। আজ আর কাউকে দূরে রাখবো না রে। ডাক্, কাছে ডাক মেয়েটাকে। দেখে যাই ভাল করে মুখখানি।

আনন্দে চীৎকার করে ওঠে দর্প : রত্না, আমার মা তোমায় ডাকছেন, তোমায় ডাকছেন রত্না। দৌড়ে এসো।

ভুল শুনছে না তো রত্না? রাণীমা তাকে ডাকছেন? ঘরে যেতে বলছেন? রত্না দৌড়ে আসে ঘরের দোরের কাছে। তারপর চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে আরো একবার জিজ্ঞেস করে : আমি?

: হ্যাঁ রে তুই। আয় মা, ঘরে আয়, কাছে আয়।

হৈমবতী গভীর মমতায় কাছে টেনে নেন আজ রত্নাকে। চিবুকটি ধরে বলেন : হ্যাঁরে, কোনদিন্ তোকে আমার ঘরে আসতে দিইনি, কাছে আসতে দিইনি,—তার জন্যে আমার ওপর তোর খুব রাগ, নারে?—ওরে, আমি তোর বোকা মেয়ে। এতদিন ভুল করেছি। দোষ নিসনি রে।

দৃশ্যটা দর্পর ভারী ভাল লাগে। বলে : এবার থেকে রোজ রত্না তোমার ঘরে আসতে পারবে মা? তোমায় ছুঁতে পারবে?

ম্লান হাসি হাসেন হৈমবতী। রোজ?—সে রোজের মেয়াদ কতটুকু আর? রত্নার কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে বলেন : হ্যাঁরে রত্না, আজ তোদের মহলে ১২ই কার্ত্তিকের খুব ধুমধাম; তোর

পিসি খুব ব্যস্ত আজ; কোমর বেঁধে দশখানা হয়ে খাটছে;—নারে?

বলতে বলতে রোগশয্যাগতা হৈমবতীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাঈমহলের অন্দরের না-দেখা ঘর-দালান। ভেসে ওঠে পিয়ারাবাঈ-এর মুখখানি। একবার দেখেছিলেন তাকে। ভোররাতে পাইক্ নিয়ে পাল্কীতে চড়ে যাচ্ছিলেন গঙ্গাস্নানে। বাঈমহলের কাছ দিয়ে যাবার সময় বড় কৌতূহলে তাকিয়েছিলেন একবার মুখ তুলে বাঈমহলের ঝুল-বারান্দার দিকে,—যদি কাউকে দেখা যায়। গেছলো দেখা। যাকে দেখতে চেয়েছিলেন হৈমবতী, তাকেই। ভোরের আবছা আলোয় জয়পুরী মেয়ের নরম মুখখানি কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় করুণায় ভরিয়ে তুলেছিল সেদিন তাঁর সমস্ত মন। গঙ্গাস্নান করতে নেমে তার জন্যেও প্রার্থনা করেছেন,— সুখে রেখো মা ওকে।

বাঈমহলের অন্দরের না-দেখা ঘর-দালানে কর্ম্মব্যস্তা সেই পিয়ারাবাঈ-এর ছবিখানি ভেসে ওঠে আজ হৈমবতীর চোখের সামনে···জয়পুরী চুন্‌রির প্রান্তভাগ কোমরে জড়িয়ে দাসী-চাকরদের নিয়ে বাঈমহলের নাচঘর সাজাচ্ছে পিয়ারাবাঈ···বাইরে থেকে এসেছেন কত গুণীজন···মৃদঙ্গ তানপুরা সারেঙ্গী রবাব্-এর সুরে ভরে উঠেছে বাঈমহল······বড় বড় ওস্তাদের রেওয়াজের সুরমূর্চ্ছনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে বাঈমহলের বাতাস···

মনে পড়ে যায় হৈমবতীর নিজের সুস্থ দিনগুলির কথা। দুর্গোৎসবের একমাস আগে থাকতেই খাসমহলের অন্দরের উঠোনে

চাকর-দাসীর দল সুরু করে দিয়েছে যজ্ঞির বাসন মাজতে…শাড়ী থান ধুতি উড়ুনিতে ভরে গেছে নিচের ঘর…মাড়-দেওয়া কোরা কাপড়ের মৃদু গন্ধে সুরভিত হয়ে উঠেছে খাসমহলের বাতাস…খাসমহলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন নিজে।… প্রদীপের সল্‌তে পাকাচ্ছেন গ্রামের বিধবার দল, নিজে হাতে কোরে পান-দোক্তার ডাবর দিয়ে এলেন তাঁদের মাঝখানে।… হরি-কামার এসে উঠেছে গোয়ালবাড়ীর পেছনের ঘরটাতে ছেলে-বৌ নিয়ে। আখ-কুমড়ো-পাঁঠা বলি দিয়ে আসছে ওরা বংশানুক্রমে। হরিকামারের ছেলেদের অন্দরে ডাকিয়ে এনে দর্জিকে দিয়ে মাপ নেওয়ালেন তাদের গায়ের।…খুনখুনে তেকেলে আইবুড়ী বসেছে একরাশ পুরাণো ছেঁড়া শাড়ী-জামা-চাদর নিয়ে। বানিয়ে চলেছে অজস্র রঙবেরঙের ন্যাকড়ার পুতুল। বিলোনো হবে গ্রামের ছেলেদের। হৈমবতী সেখানে বোসে নিজে হাতে চোখ এঁকে দিলেন হয়তো গোটাকতক পুতুলের।…আনন্দ নাড়ুর চাল কুটতে ঢেঁকিতে পাড় দিয়েছে গ্রামের সধবারা, তাদের সরিয়ে হাসতে হাসতে নিজেই ঢেঁকিতে পাড় দিলেন খানিকটা ;—পানের ডিবে সবার দিকে এগিয়ে দিয়ে রঙ্গ-তামাসাই করে গেলেন কিছুক্ষণ। …মহাষ্টমীর দুপুরে অন্নবাড়ীর উঠোনে প্রজাদের সবাইয়ের পাতে নিজে হাতে পরিবেশন করেছেন পরমান্ন। সে পরমান্ন মুখে তুলে প্রজারা একবার তাকিয়েছে দুর্গাপ্রতিমার দিকে, আর একবার তাদের রাণীমার স্বেদসিক্ত মুখখানির দিকে ;—দুটি মুখ এক হয়ে গেছে তাদের চোখে।…মহানবমীর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা যখন বেজেছে, সোনার হাতল দেওয়া শ্বেতচামর দুলিয়ে সারাক্ষণ বাতাস করেছেন

প্রতিমাকে।…গ্রামের সকল বউঝিদের সঙ্গে একসঙ্গে বোসে রাত জেগে উপভোগ করেছেন যাত্রাগান, কীর্ত্তন, কথকতা।… কোথায় হারিয়ে গেল হৈমবতীর জীবনের সেই কর্ম্মচঞ্চল আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি।

আজ চার বছর ধরে রোগশয্যায় শুয়ে একটু একটু করে হারিয়ে চলেছেন রাণী তাঁর সেই দিনগুলিকে। সংসারটা ক্রমেই তাঁর কাছ থেকে চলে যাচ্ছে দূরে,—আর সেইসঙ্গে সংসারের কর্ত্তাও। সেই পুরোনো দিনগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনবার শক্তি নেই আর হৈমবতীর,—শক্তি নেই সেই পুরোনো রাজাটিকে পুরোনো দিনের মতো করে কাছে টেনে নেওয়ার।……

মনটাকে অতীত থেকে বর্ত্তমানে ফিরিয়ে আনেন হৈমবতী। বাঈমহলের মেয়ে রত্নাকে কাছে টেনে নেন। স্নেহসিক্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন: তোমার জল্‌সায় বুঝি শুধু সরকার মশায়ের গানই হবে? আর তুমি নাচবে না মা?

ছোট্ট ঘাড়টিকে এক দিকে হেলায় রত্না।

: বেশ।—এই নাও মা, তোমার সেই নাচের বক্‌শিস্‌।

নিজের গলার চন্দ্রহার খুলে দেন হৈমবতী রত্নার হাতে। ইতস্ততঃ করে রত্না। কেমন ভয় ভয় করে তার। দর্প বলে: নাও না, মা দিচ্ছেন যে। নিতে হয়।

চন্দ্রহার নিয়ে ছোট্ট হাতে কুর্ণিশ জানায় রত্না। কুর্ণিশের চমৎকার ভঙ্গিটি এরই মধ্যে রপ্ত করে ফেলেছে সে। কুর্ণিশ জানিয়ে বলে: দর্পকে নিয়ে যাবো রাণীমা?

রত্নার জলটুঙ্গীর জলসায় যাবার অনুমতি পেয়ে যায় দর্প। কতকটা জোর করেই পাঠিয়ে দেন যেন হৈমবতী দর্পকে। তারপর ওরা চলে গেলে চুপ করে শুয়ে থাকেন দু-চোখ বুজে।

হঠাৎ কপালে কার হাতের ছোঁয়া লাগে। চোখ মেলে দেখেন মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন অনন্তনারায়ণ। চোখ মেলতেই প্রশ্ন আসে সমবেদনার সুরে : কেমন আছ আজ বড়বৌ ?

: ওমা ! তুমি !—এসো, এসো।

: বুকের যন্ত্রণাটা কমেছে কিছু ?

: হ্যাঁ।

: লুকিও-না। সত্যি বলো।

: ভাল আছি গো। খুব ভাল আছি।

: শুনলুম, আজ তুমি বিকেলের ওষুধ ফিরিয়ে দিয়েছ ?

: ওগো,—এক দিন নাই বা খেলুম। একটা দিন আমার বাঁধাধরা কাজে দাও না একটু ভুল করতে।

: আজ সকালে তোমার সামনে বসে খাবার সময় পাইনি বলে রাগ করোনি তো বড়বৌ ?

: না, না।—বাঈমহলে আজ খুব ধুমধাম না গো ?

: যেমন হয়ে থাকে আর কি ফি বছর।—আচ্ছা, জগদ্ধাত্রী পূজো তো আর কিছুদিন পরেই। শহর থেকে ভাল যাত্রাগানের দল আনাবো,—শুনবে ?.

সে কথার উত্তর আসে না। ক্লান্তকণ্ঠে হৈমবতী ডাকেন : শোনো, কাছে সরে এসো।

গভীর সহানুভূতির সুরে অনন্তনারায়ণ বলেন : কি বলছো বড়বৌ ?

: এ পদ্মথালায় একগাছি মালা আছে, পরো না গো গলায়।

: আজ তোমাকে যেন আমি ঠিক্ বুঝতে পারছি না বড়বৌ।—সত্যি করে বল তো কি হয়েছে তোমার আজ?

: বদলে গেছি যেন হঠাৎ, না গো? কিন্তু পরো আগে মালাটা।

সে যুগের ক্ষত্রিয়-রমণীরা যেমন হাসি মুখে স্বামীর বুকে বর্ম বেঁধে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিতেন,—হৈমবতীও ঠিক তেমনি কোরে নিজের হাতে গাঁথা মালা পরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বিদায় দিতে চান স্বামীকে। কিন্তু বুকের ভেতরে মোচড় দেয় কেন?

মালাটা গলায় পরেন অনন্তনারায়ণ। বলেন: পরলাম। কিন্তু এ কেন বড়বৌ?

: আমার কেমন শখ্ হোল।—শখ্ কি হতে পারে না আমার?

কেন হবে না? এত দিন শখ্ হয়নি বলেই তো অপরাধী হয়ে আছেন অনন্তনারায়ণ তাঁর কাছে। আড়ষ্ট হয়ে আছেন সদাই।

চোখ দুটো ছল্ ছল্ কোরে ওঠে কেমন অনন্তনারায়ণের। হেঁট হয়ে হৈমবতীর রোগতপ্ত ললাটে হাত রেখে বলেন: তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো বড়বৌ। তারপর আব্দার করো আমার কাছে,— হুকুম করো।

আব্দার? হ্যাঁ করবেন আজ হৈমবতী। যা এ-চার বছরে কোনোদিন বলেননি, তাই বলবেন। যা কোনদিন করেননি, তাই করবেন।

ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা টেনে হৈমবতী বললেন: তাহলে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।

কিন্তু হয় না। বাঈমহল থেকে ঘন ঘন তাগাদা আসে, অনন্ত-

নারায়ণের সেখানে উপস্থিত হওয়া দরকার। ইতস্তত করেন অনন্ত-নারায়ণ। ইচ্ছে হয় আর একটু থেকে যেতে হৈমবতীর পাশে। এতদিনের দূরের মানুষটা আজ হঠাৎ যেন নাগালের মধ্যে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি তার সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে ঠিক মন চায় না যেন। কিন্তু আবার তাগাদা আসে—মজ্‌লিসে সবাই অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

ম্লান হেসে হৈমবতী বলেন : আর দেরী কোরো না। সেখানে কত বাইরের লোক অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।

কিন্তু যাবার পথে একটু বাধা দেন হৈমবতী। বলেন : এই রুমালটা তোমার পায়ে ছুঁইয়ে দেবে?

: কি হবে?

: উঠে দাঁড়িয়ে তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করি, সে শক্তি তো আর রাখেন নি ভগবান।

: আজ হঠাৎ এমন সময় প্রণামেরই বা দরকার হল কেন?

: বললাম তো,—আজ কেমন অদ্ভুত শখ্‌ হচ্ছে।

রুমাল নিয়ে কপালে চেপে ধরেন হৈমবতী। তারপর আবার বাধা দেন অনন্তনারায়ণের গমন পথে—

: ওগো, শোনো। বাঈমহলের ঐ পিয়ারা মুখপুড়ীকে বোলো, আসছে জন্মে সে যেন বাপু আমাদের জাতের মেয়ে হয়ে আমার সতীন হয়ে জন্মায়। বেশ দুই-সতীনে পাশাপাশি ঘর করবো তোমাকে নিয়ে। ঝগড়া হবে,—আবার ভাব হবে। এমন দূর-দূর সতীন-পনা ভাল লাগেনা বাপু।

আবার তাগাদা আসে বাঈমহল থেকে। মজ্‌লিস্ সুরু হতে

পাচ্ছে না খাস্‌মহলের মালিককে না পেয়ে। নিচের আস্তাবলে ঘোড়াটা পা ঠোকে আর ডাকে, চিঁ হি-হি।

রাত তখন তুপুর। মিশীরজী তখন বাগেশ্রীতে খেয়াল ধরেছেন একটা। সুরে ভরে উঠেছে বাঈমহলের নাচঘর। হঠাৎ আচম্‌কা সুর যায় কেটে। খাস্‌মহল থেকে খবর আসে, রাণীমা হঠাৎ কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর ভাল নয়।

মজলিস্‌ ভেঙ্গে যায় তখনি। অনন্তনারায়ণ পাগলের মতো ছুটে যান খাস্‌মহলে।

পিয়ারাবাঈ রুদ্ধ নিশ্বাসে রাতের অন্ধকারে একা ঝুল-বারান্দায় এসে দেখেন খাস্‌মহলের পূব্‌-ঘরের জানালার খড়খড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

ওকি চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল?

পূব্‌-ঘরের সমস্ত জানালার খড়খড়িগুলো খুলে দেওয়া হল তিন দিন পর। ভুবনপুরের পূব্‌-আকাশে তখন সূর্য্যদেব সবেমাত্র উঁকি দিয়েছেন। ভুবনপুরের আকাশে সবেমাত্র উঠেছে পাখীদের কাকলী।

ভোরের বাতাস খোলা-জানালার ভিতর দিয়ে পূব্‌-ঘরের মধ্যে ঢুকে কানে কানে শুধোলো, কেমন আছ গো ভুবনপুরের রাণী?

একটু যেন ক্ষীণ হাসির রেখা হৈমবতীর পাণ্ডুর মুখে।

বজ্রাহত বনস্পতির মতো একধারে দাঁড়িয়ে অনন্তনারায়ণ। দর্প ঘুমোচ্ছে তখনো পাশের ঘরে। নির্ব্বাক কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে খাস্‌মহলের দাস-দাসী আমলা-গোমস্তা আশ্রিত-জনেরা এখানে-ওখানে। অনিবার্য্য শেষ মুহূর্ত্তটির আর দেরী নেই বেশি।

হৈমবতী তাকালেন একবার চোখ তুলে। অষ্টভুজার মন্দিরের পুরোহিত সাশ্রুনেত্রে কম্পিত হস্তে মায়ের চরণামৃত পান করালেন। প্রভাত-সূর্য্যের লাল আলো এসে পড়লো হৈমবতীর কপালে। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সিঁথির সিঁদুর।—সূর্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে এ ভুবন থেকে বিদায় নিলেন ভুবনপুরের রাণী।

দশ দিন কেটে গেছে। সকালে দাঁড়িয়ে ছিলেন পিয়ারাবাঈ ঝুল-বারান্দায়। স্বর্গতা রাণীমার জয়ধ্বনি করতে করতে ফিরে যাচ্ছে ভুবনপুরের অনাথ-আতুরের দল। তাদের কলধ্বনি এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে।

গঙ্গাপ্রসাদ সরকারকে খবর নিতে পাঠিয়েছিলেন পিয়ারাবাঈ। তিনি এসে খবর দিলেন, শ্রাদ্ধ শেষ হয়েছে। ওদিকের অন্ন-বাড়ীর উঠোনে এখন কাঙালী বিদায় হচ্ছে।

ঐ অন্নবাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ নিয়ে দু'হাতে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উজাড় কোরে দিতেন যে-রাণীমা, সেই রাণী যে তাঁর রায়বাড়ীর রাজ্যপাট ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন,—কেই বা ভাবতে পেরেছিল?

পিয়ারাবাঈ গঙ্গাপ্রসাদকে শুধোন: আর দর্প? সে কোথায়?

: খোকাবাবুকে নিয়েই তো মুস্কিল। কেউ খাওয়াতে পারছে না কিছু তাকে। চুপ করে বসে আছে। চোখে বড় বড় জলের ফোঁটা।—বলতে বলতে গলা ধরে আসে গঙ্গাপ্রসাদ সরকার মশায়ের।

সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে রত্না। হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকে: পিসিমা, ও পিসিমা।

: কি রে? হাঁপাচ্ছিস্ কেন?

: নিতাইদাকে বলো না পিসিমা, কিছুতেই ও' আমাকে আম্লকির আচার পেড়ে দিচ্ছে না বয়েম্ থেকে।

: এখন এই অবেলায় কি হবে আম্‌লকির আচার ?

বড় বড় চোখছুটোকে পিসিমার দিকে তুলে রত্না বলে : বারে,—দর্প খাবে যে ।

দর্প ! যাকে কেউ কিছু খাওয়াতে পারছে না, চুপ্‌টি কোরে যে বোসে আছে চোখে বড় বড় জলের ফোঁটা নিয়ে, সে আম্‌লকির আচার খেতে চেয়েছে বাঈমহলের রত্নার হাতে !

রত্নাকে ছু'হাতে বুকের কাছে টেনে নিয়ে পিয়ারাবাঈ শুধোন : হ্যাঁরে, খাওয়া হয়েছে তার ?

আবার বড় বড় চোখে রত্না পিসিমার মুখের দিকে তাকায়। বড়রা কি কিছু বোঝে না ? বলে : কি করে হবে ? ওর রাণীমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে কি না ? তাই কিছু খেতে চাইছে না। ও-মহলের দাসীরা সব ডেকে ডেকে ফিরে গেল। নায়েবমশাই কত ডাকলেন,—আমিও কতো কোরে বললুম ;—সেই গাব্‌দা মুখ কোরে বসে রইল। যখন বললুম,—'আম্‌লকির আচার খাবে দর্প ?'—তবে ছেলে ঘাড় নেড়ে বললো—হ্যাঁ। বলো না পিসিমা নিতাইদাকে আচারের বয়েমটা পেড়ে দিতে। আমার যে হাত যায় না।

রত্না পিয়ারাবাঈ-এর আঁচল খোরে টানে। পিয়ারাবাঈ ডাক দেন বাঈমহলের সর্দ্দার-নফর নিতাইচরণকে : নিতাই, ওরে তাড়াতাড়ি পেড়ে দে বয়েম্‌টা, ও-মহলের খোকা খেতে চেয়েছে।

সন্ধ্যার একটু আগেই অনন্তনারায়ণ শান্ত পদক্ষেপে এসে ঢোকেন বাঈমহলে। গায়ে আজ মের্জাই নেই, সাদা উড়নি। চুল অবিন্যস্ত,

চোখদুটো ম্লান। এ ক'দিনেই অনন্তনারায়ণ যেন আধখানা হয়ে গেছেন। হৈমবতীর মৃত্যুর পর এই প্রথম ঢুকলেন বাঈমহলে।

ভাঁড়ারে বসে দু'খানা পাথরের রেকাবীতে ফল কেটে সাজিয়ে রাখছিলেন তখন পিয়ারাবাঈ। নিচের বাগানে ফোয়ারার ধারে আছে দর্প আর রত্না,—চারু দাসীর হাতে ফলের থালা পাঠিয়ে দিতে হবে সেখানে। এমন সময় খবর এল, নাচঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন খাস্‌মহলের রাজা। ধড়মড় করে উঠে পড়লেন পিয়ারাবাঈ।

এ ক'দিন নিজেকে বেশ সামলে রেখেছিলেন অনন্তনারায়ণ। প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য কাজ নিখুঁত ভাবে করে গেছেন। বিচলিত হতে দেখেনি কেউ তাঁকে একটুও। সকালে শ্রাদ্ধের আসনে যখন বসে ছিলেন ছেলেটিকে পাশে নিয়ে, তখনও ছিলেন স্থির অবিচল। নায়েব এসে যখন জিজ্ঞেস করলেন,—'[illegible] নগদ-বিদায় কত কোরে দেওয়া হবে হুজুর?'—অন্যমনস্কভাবে চিরদিনের অভ্যাস মতো হঠাৎ বলে ফেললেন,—'ওপরে তোমাদের রাণীমার কাছে জিজ্ঞেস করে এসো নায়েব।—তিনি যেমনটি বলবেন, তেমনটিই দেওয়া হবে।'—বলে ফেলেই সেই যে চম্‌কে উঠলেন,—তারপর থেকে আর কিছুতেই যেন সামলাতে পারছেন না নিজেকে!

রায়বাড়ীতে আজ এতবড় একটা যজ্ঞি হয়ে গেল, অথচ ভাঁড়ারের চাবি চাইতে কাউকে একবারো হৈমবতীর কাছে যেতে হল না,—একথাটা আজ সারাদিন বড় মর্ম্মান্তিক ভাবে নাড়া দিয়েছে তাঁর মনকে।

সারাটা দুপুর একা ঘরে বসে বার বার মনে করতে চেয়েছেন

হৈমবতীর মুখখানি। কিন্তু কিছুতেই পারেন নি। তাঁর ঘর, তাঁর কথা, তাঁর বিছানা, তাঁর শাড়ীর পাড়, তাঁর বসে থাকার ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত চোখ বুজলেই মনে পড়ছে;—কিন্তু মুখটুকু যে কিছুতেই চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না!

কেন? কেন এমন হয়?—দশ দিনের মধ্যেই হৈমবতী কেন এমন কোরে দূরে সরে যায়?

পিয়ারাবাঈ কাছে এসে দাঁড়ান। শান্ত মধুর কণ্ঠে শুধু বলেন: বোসো।

বসলেন অনন্তনারায়ণ।

হাতপাখায় অনেকক্ষণ নীরবে বাতাস করতে করতে পিয়ারাবাঈ বললেন: বড় রোগা হয়ে গিয়েছ ক'দিনে।

ম্লান হাসলেন অনন্তনারায়ণ।

তারপর আবার নীরব দুজনেই।

বারান্দার দেয়ালে দেয়ালগিরির ঠিক তলায় কাঁচে বাঁধানো এক জোড়া রাঙা-পায়ের ছাপ টাঙ্গানো রয়েছে,—সেই দিকে হঠাৎ নজর পড়ে অনন্তনারায়ণের।

রাণী হৈমবতীর রাঙা পায়ের ছাপটুকু টগর-ঝিকে দিয়ে তুলিয়ে এনে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন পিয়ারাবাঈ। প্রণাম করেন রোজ ঐ পায়ের তলায় দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে। গলায় আঁচল দিয়ে প্রার্থনা করেন,—রাণী গো, ওপার থেকে আশীর্ব্বাদ করো, যেন আসছে জন্মে তোমার দাসী হয়ে জন্মাতে পারি।

: যাঁর পায়ের ছাপ এখানে টাঙিয়েছ পিয়ারা, দেখেছিলে তাঁকে কোনদিন ?

: হ্যাঁ। একটিবার, শুধু একটিবার। একবার কি একটা যোগের সময় পাইক্ সঙ্গে নিয়ে ভোররাত্রে পাল্‌কী কোরে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। আমাদের এই মহলের সামনে দিয়ে যাবার সময় কি জানি কি মনে করে পাল্‌কীর দরজা সরিয়ে তাকালেন ওপর দিকে। আমি কেন বুঝি দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায় ;—লজ্জায় সরে গেলাম। ভোর রাতের আবছা আলোয় অস্পষ্ট দেখেছিলাম তাঁর মুখ। সেই একবার। আর দেখিনি। কিন্তু সে-মুখ জীবনে ভুলবো না।

শ্রদ্ধায় কাঁপতে থাকে পিয়ারাবাঈ-এর কণ্ঠ।

কিছুক্ষণ পর হাতপাখাটা নামিয়ে রেখে পিয়ারাবাঈ বলেন : আসছি এখনি। চলে যেও না যেন।

ঘর ছেড়ে বাইরে যান পিয়ারাবাঈ। অনন্তনারায়ণ ধীর পদ-ক্ষেপে পদচিহ্নের ছবিটির নিচে এসে দাঁড়ান। মনে হয় যেন শুনতে পাচ্ছেন হৈমবতীর শেষ কথা ক'টি,—'[illegible] ঐ পিয়ারা মুখপুড়ীকে বোলো, আসছে জন্মে সে যেন বাপু আমাদের জাতের মেয়ে হয়ে আমার সতীন হয়ে জন্মায়। বেশ দুই সতীনে পাশা-পাশি ঘর করবো তোমাকে নিয়ে। ঝগড়া হবে, আবার ভাব হবে। এমন দূর-দূর সতীনপনা ভাল লাগেনা বাপু।'

আশ্চর্য্য !—একজন চায় কাছে টানতে,—আর একজন চায় দূরে থেকে প্রণাম জানাতে।—অনন্তনারায়ণের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে।

ঘরে ঢোকেন পিয়ারাবাঈ। হাতে মিশ্রীর সরবৎ। বলেন : ধরো।

মিশ্রীর সরবৎ খেয়ে মস্‌লিনে মুখ মোছেন অনন্তনারায়ণ। শান্ত কণ্ঠে শুধু বলেন : বড় বৌ বড় অসময়ে চলে গেলেন পিয়ারা। দর্পটা এ ক'দিন একবারো তাঁর ঘরে ঢোকেনি। ও বুঝতে পেরেছে, বড়বৌ যেখানে গেছেন, সেখান থেকে আর ফিরবেন না কোনদিন। —ওকে দেখবার আর কেউ রইলোনা পিয়ারা।

রূপোর গেলাসটা পাথরের টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পিয়ারাবাঈ মৃদু কণ্ঠে বলেন : কথা বলবো একটা ?

: বলো।

: কথা দাও, আমার কথা রাখবে ?

: অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখবো পিয়ারা।

: তুমি ইচ্ছে করলেই তা সম্ভব হয়।

: বলো।

: দর্পর কি সত্যিই কেউ রইল না ?

কিসের যেন সুর বাজে পিয়ারার কণ্ঠে ? অনন্তনারায়ণ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তাঁর মুখের দিকে। তারপর স্থিরকণ্ঠে বলেন : কি বলতে চাও ?

: আমি কি কেউ নই তোমার ?

তবু স্পষ্ট হতে পারছেন না পিয়ারাবাঈ। কোথায় যেন বাধছে।

: বলছিলুম…দর্প যদি আজ থেকে…

বাকিটা কিছুতেই শেষ করতে পারেন না পিয়ারা। শেষ কোরে দেন অনন্তনারায়ণ নিজেই : যদি আজ থেকে এই বাঈমহলে তোমার কাছে থাকে ?

অনন্তনারায়ণের কথার সুরটা যেন কেমন কেমন লাগে পিয়ারার। বলেন: তা কি হয় না?

ম্লান হাসেন অনন্তনারায়ণ: কথাটা আমারো একবার মনে হয়েছিল পিয়ারা। তাহলে তো দর্প'র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।

আবার আশায় চোখদুটো চক্‌চক কোরে ওঠে পিয়ারার: তবে···?

ঘাড় নাড়েন অনন্তনারায়ণ: কিন্তু তা' হবার নয়।

: কেন?—কান্নার সুর পিয়ারার কণ্ঠে!

: তা কি বুঝতে পারো না?—সমবেদনার সুর অনন্তনারায়ণের কথায়।

: সমাজ?—কথাটাকে স্পষ্ট কোরে জেনেও যথাসাধ্য অস্পষ্ট কোরে উচ্চারণ করেন পিয়ারাবাঈ।

: হ্যাঁ।

না বলতে পারলেই যেন বেঁচে যেতেন অনন্তনারায়ণ।

: কিন্তু···

: পৃথিবীতে অনেক কিছুই হলে ভাল হয়। কিন্তু তবু তা' হয় না, তা' হয় না পিয়ারা।

: কিন্তু ওর যে মা নেই।

: মা নেই,—কিন্তু সমাজ আছে।

: মা-মরা কচি ছেলে,—দাসীরা কি যত্ন করতে পারবে ওর ঠিক?

: না।

: তবে?

: তবু রায়বংশের ছেলে খাস্‌মহল ছেড়ে বাঈমহলে তো মানুষ হতে পারে না।

: কেন ? কেন পারে না ?

: ওর ইজ্জৎ।

শুনে চম্‌কে ওঠেন পিয়ারা। কিন্তু তারপরেই অত্যন্ত শান্ত চিত্তে গ্রহণ করে নেন কথাটা। নিতান্ত কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলেন : মাঝে মাঝে বড় ভুল হয়ে যায় যে আমি জয়পুরের বাঈজীর ঘরের মেয়ে।

অনন্তনারায়ণ বেশ বুঝতে পারেন, কোন্ দুর্ব্বল স্থানে আঘাতটা গিয়ে বেজেছে। সহানুভূতির সুরে বলেন : অভাগা, অভাগা ও পিয়ারা। তোমার স্নেহের স্পর্শ পাবার উপায় নেই ওর। দাসীর হাতে মানুষ হওয়া লেখা আছে ওর ভাগ্যে।—নৈলে মা তো অনেকেরই মরে ;—মাসী-পিসিও কি থাকতে নেই ওর ?

পিয়ারাবাঈ আবার যেন একটু আশার আলো দেখতে পান। অনেকখানি প্রত্যাশা নিয়ে বলেন : আমাকে ও' মাসী বোলে ডাকে।

করুণ হেসে অন্তনারায়ণ বলেন : লুকিয়ে। সে ডাক তোমার এই বাঈমহলের চারটি দেয়ালেই আটক্ থাকে পিয়ারা। সমাজের মুখোমুখি হয়ে তার বাইরে বেরুবার সাহস নেই।

কিন্তু সমাজ কেন এ-বোকামী করে ?

পিয়ারা বলেন : আমি যদি দাসী হতাম তোমার খাস্‌মহলের ? যদি হতাম ওর ধাইমা ?

উহ্য থাকে,—'তাহলে তো সমাজ রাজী হোতো দর্পকে আমার হাতে মানুষ হতে দিতে ?'

অনন্তনারায়ণ স্থির কণ্ঠে বলেন : তা তো তুমি নও।

: কিন্তু তার চেয়েও কি আপনার নই ?

: হ্যাঁ। কিন্তু তার চেয়েও দূরের ;—অনেক দূরের !

পিয়ারাবাঈ আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, অনন্তনারায়ণ বাধা দিয়ে বলেন : এ-প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করো পিয়ারা। জিজ্ঞেস করে তোমার যা দুঃখ, উত্তর দিতে গিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি দুঃখ আমাকে পেতে হচ্ছে। আজ উঠি। দেখি, ছেলেটা আবার কোথায় একা-একা রইল।

: সে কোথায় আছে দেখবে ?

: কোথায় ?

: এসো।

পিয়ারাবাঈ অনন্তনারায়ণকে নিয়ে যান ঝুল-বারান্দায়। অনন্তনারায়ণ দেখেন নিচের বাগানে পাথরের। ফোয়ারার পাড়ে পাশাপাশি বোসে আছে দর্প আর রত্না। সূর্য্যাস্ত কখন্ হয়ে গেছে। আকাশের বুকে জেগে উঠেছে একটি দুটি কোরে অনেকগুলি তারা। সেই তারাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে রত্না বলছে : ঐ যে সব তারা, ঐ তারাদের মধ্যে আছেন রাণীমা। দর্প, রাণীমা সব সময় তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। তুমি যদি কিছু না খাও, তাহলে ঐ তারাদের ভেতর থেকে রাণীমা খু-উ-ব কষ্ট পাবেন।

মুণ্ডিত মস্তকে দর্পকে যেন আরো ছোট দেখাচ্ছে, চোখদুটো যেন আরো করুণ। সেই করুণ চোখদুটি তুলে দর্প একবার তাকায় আকাশের তারাদের দিকে, তারপর রত্নার মুখের পানে।

রত্না বলে : একথা সত্যি দর্প। আমারও তো মা নেই। পিসিমা বলেছেন, মা আছেন ঐ তারাদের মধ্যে। তাই তো আমি জানলুম। এই নাও, খাও দর্প, আম্লকির আচারও এনেছি; খাও।

রত্না পাথরের রেকাবিটা তুলে দেয় দর্পর হাতে।

আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে নীরব ভাষায় দর্প যেন বলে, মাগো, এই ছাখো আমি খাচ্ছি। তারপর মুখে তুলে দেয় এক টুকরো মিষ্টি।

ঝুল-বারান্দা থেকে সরে আসেন অনন্তনারায়ণ। উড়ানিতে চোখ মুছে বল্লেন : তোমার ঐ ভাইঝিটির নামটি কি যেন পিয়ারা?

: রতন, রত্না।

: মেয়েটি বড় লক্ষ্মী।

এতবড় সুযোগটা হাতছাড়া করেন না পিয়ারাবাঈ। তাড়াতাড়ি বলেন : দর্পকে আজ তোমার খাস্‌মহলের কেউ খাওয়াতে পারেনি কিছু।

ইঙ্গিতটা বুঝতে একটুও বিলম্ব হয়না অনন্তনারায়ণের। পিয়ারাবাঈ-এর মধ্যে যে একটি চিরকালের -মা রয়েছে, তার কাঙালপনা প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারেন তিনি। কিন্তু তবু বলতে হয় : কিন্তু তবু দর্পকে খাস্‌মহলেই মানুষ হতে হবে পিয়ারা। যারা আজ ওকে কিছুতেই খাওয়াতে পারেনি, সেই চাকর-দাসীদের কাছেই মানুষ হতে হবে ওকে।

: যদি বাছার পেট না ভরে?

পিয়ারাবাঈ-এর হাত ছুটো তুলে নেন এবার অনন্তনারায়ণ তাঁর নিজের হাতে। অত্যন্ত দরদের সঙ্গে বলেন : না ভরে, বাঈমহলের মেয়ে রত্না তো রইল; সে লুকিয়ে আম্‌লকির আচার খাওয়াবে।

আবার দুজনে পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন ঝুল-বারান্দায়।

নিচে তখন দর্প আকাশের দিকে চোখ তুলে রত্নাকে বলছে : ঐ যে দুটি তারা পাশাপাশি, আমার মা আর তোমার মা বুঝি রত্না ?

এমনি কোরে কেটে গেল অনেকগুলো দিন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ঘুরে ঘুরে এল। এল আর চলে গেল। এমনি কোরেই সুখে দুঃখে অনন্তনারায়ণের পাশে এসে দাঁড়ালেন পিয়ারাবাঈ। এমনি কোরেই সদাজাগ্রত দু-জোড়া স্নেহার্দ্র চোখের ছায়ায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলো দর্প আর রত্না। এমনি কোরেই বাঈমহলের রত্না আমলকির আচার দিয়ে মান ভাঙালে খাস্‌মহলের দর্প'র।

ভুবনপুরের ঘন্টাফটকের উপর দিয়ে আরো এগারোটা বছর তার গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের ছ'টা তুলির রঙ্ বুলিয়ে গেছে। ফটকের দক্ষিণের কার্ণিশের ফাঁকে অশ্বত্থের যে ছোট্ট চারাটি উঁকি ঝুঁকি মারতো,—আজ তার মোটা শেকড়গুলো ঘন্টার লোহার শেকলের মতোই শক্ত হয়ে আঁকড়ে ধরেছে ঘন্টাফটকের পুরোনো থিলেনটাকে। ফটকের নিচে পথের একপাশে একখানি কাপড় বিছিয়ে বসে যে বৃদ্ধ ভিখিরিটি গান গেয়ে ভিক্ষে করতো,—মারা গিয়েছে সে। ভিখিরি নেই,—কিন্তু তার মাথার তেলের দাগটি এখনো লেগে আছে ঘন্টাফটকের দেয়ালের গায়ে।

ঘন্টাফটকের ঘন্টাদার বৃন্দাবন দাসের মাথার চুলগুলো আরো অনেক পেকে গেছে। মা-মরা যে ছোট্ট বেড়াল ছানাটিকে পুষেছিল বৃন্দাবন এগারো বছর আগে, সেটিও দুটি ছানা রেখে বিদায় নিয়েছে ঘন্টাফটক থেকে। শুধু বিদায় নেয়নি বৃন্দাবন নিজে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী-পুত্রহীন এই নিঃসঙ্গ মানুষটি ঘন্টাফটকের উপরকার ঘরটির মধ্যে মাথা গুঁজে তেমনি বাজিয়ে চলেছে ঘন্টা দিনের পর দিন।

সন্ধ্যা সাতটার ঘন্টা বেজে উঠলে আজো খাস্‌মহলের রাজা আসেন বাঈমহলের নাচঘরে। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কিন্তু আর মুখর কোরে তোলে না বা[illegible]হলের মধ্যবর্ত্তী পথটা। ঘোড়াটা বুড়ো হয়ে গেছে। অনন্তনারায়ণ পাল্কীতে আসেন।

সন্ধ্যা সাতটার ঘণ্টা শুনে আজো জ্বলে ওঠে বাঈমহলের নাচঘরের ঝাড়-লণ্ঠন। কিন্তু ওঠে না আর নূপুরের নিক্বণ। নিজে হাতে ফল আর মেওয়া পাথরের রেকাবিতে সাজিয়ে রাখেন পিয়ারাবাঈ। রূপোর পদ্মবাটিতে কিছু ঘন দুধ। আলবোলার জরির তার-মোড়া লম্বা নলটাকে গুছিয়ে রাখেন মখমলের তাকিয়ার উপর। আওরাঙ্গাবাদের মিনে-করা পানের কৌটটা এগিয়ে রাখেন ধবধবে চাদর-পাতা নরম গদীর মাঝখানে।

রাত্রের ফলাহার বাঈমহলেই সারেন আজকাল অনন্তনারায়ণ। তারপর কোনদিন একটু গান, কোনদিন বা শুধুই কথা। তারপর রাত দশটা বাজলে আবার পাল্কীতে গিয়ে ওঠা। ফিরে আসা খাস্‌মহলে।

তখন হয়তো নিজের ঘরের মেহগ্‌নির পালংকে শুয়ে গুন্ গুন্ করে গান ধরেছে তরুণ দর্পনারায়ণ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানার উপর। বাঈমহলের রস্তার কাছ থেকে শুনে-আসা গানটির অন্তরার দিকটা বার বার গুন্ গুনিয়ে গেয়েও ঠিক মনের মতন লাগছে না।

কিংবা হয়তো, ঐ যে হরিপদ,—টানা-পাখা টানে যে ঘরের বাইরে টুলের ওপর বসে বসে,—তারই সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছে ঝগড়া। সারারাত তাকে টানাপাখা টানতে দেবে না দর্প কিছুতেই। হোক্ গরম, না আসুক তার ঘুম,—তবুও।

কিংবা, ভোরে উঠে কোন্ জলার ধারে যাবে শিকার করতে,—তারই তোড়জোড় করছে কালী সর্দারের সঙ্গে বসে।

আর বাঈমহলে?—বাঈমহলে পিয়ারাবাঈ-এর ঠিক পাশের ঘরটিতে ফুলের মত কোমল একটি মেয়ে হয়তো তখন ডুব দিয়েছে তার কুমারী-মনের মধুর স্বপ্নের অতলে। কিংবা ঘুম না-আসা রাতে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মেয়েটি চেয়ে আছে নিঝুম্ খাসমহলের একটি মাত্র আলোকিত জানালার দিকে। এত দূর থেকে দেখা যায় না কিছুই। তা' হোক্। রম্ভা জানে, ও জানালাটা দর্পর ঘরের। আর জানে, দর্পরও চোখে ঘুম আসেনি এখনো।

এমন করে অন্ধকারে দুই মহল তাদের দুটি বাতায়নের বিনিদ্র চোখ মেলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে যে কত রাত,—সে-কথা জানে বোধ হয় একমাত্র ঐ ঘণ্টাকণ্টক;—প্রতিদিন গভীর রাতের মাঝখানেও যে ঢং-ঢং কোরে একবার বেজে উঠে জানিয়ে দেয়,—সে জেগে আছে।

সব জানে ঘণ্টাকণ্টক; সব জানে। শুধু ভুবনপুরের রায়বংশের অতীতই নয়,—তার ভবিষ্যতের কথাও বুঝি তার জানা। নৈলে কখনো কখনো তার ঘণ্টার শেকল হঠাৎ কেন জড়িয়ে গিয়ে ঘণ্টাকে নীরব করিয়ে দেয়? আর, ঠিক তখনই কেন একটা করে অঘটন ঘটে ভুবনপুরের রায়বংশে?

এগারো বছর আগে একদিন রাত্রে বালক দর্পকে মাতৃহীন করে হৈমবতী যেদিন চিরজন্মের মতো চলে গেলেন রায়বাড়ী ছেড়ে,—ঘণ্টাকণ্টকের ঘণ্টা সেদিন বাজেনি। বৃন্দাবন ঘণ্টাদার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে লোহার শেকলের অবাধ্যতা ঘোচাতে; পারে নি।—তারও আগে অনন্তনারায়ণের পিতা বীরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর

দিনটিতেও আশ্চর্য্যভাবে নীরব হয়ে গিয়েছিল ঘণ্টাফটকের অষ্টধাতুর ঘণ্টা।—সব জানে ঘণ্টাফটক ;—সব জানে।

জানে সে, বাঈমহলের তরুণী মেয়ে রম্ভা শ্বেতপাথরের ফোয়ারার কিনারে বসে অপেক্ষা করছে খাস্‌মহলের দর্পর জন্যে। জানে সে, উনিশ বছরের একটি কুমারী মেয়ের মন কত নরম। আর, জানে বলেই তো দুষ্টুমী করে বিকেলবেলার সবকটা ঘণ্টা যেন অনেক তাড়াতাড়ি বাজিয়ে দিয়ে রাগিয়ে দিলে রম্ভাকে।

ঘণ্টাফটকে সন্ধ্যা পাঁচটার ঘণ্টা বেজে উঠতেই বাঈমহলের বাগানের ফোয়ারার কিনার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রম্ভা। অভিমানে মুখখানি রাঙা। হাতের স্থলপদ্মটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ফোয়ারার জলে।

কী ভাবে কি দর্প?—ফোয়ারার ধারে তার পথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কি কোন কাজ নেই রম্ভার? খাস্‌মহলের রাজকুমার কখন্ এসে রম্ভার নিজে হাতে তৈরী জয়পুরী ঘিয়ের খাবার দয়া করে একটু মুখে দিয়ে ধন্য করবেন, সেই আশায় বসে থাকবে না কি বাঈমহলের মেয়ে চোপর দিন? বাঁদী না কি রম্ভা?—তিনটেয় আসবার কথা, পাঁচটা বেজে গেল। নাঃ, অসম্ভব! এমন কথার খেলাপ সত্যিই অসহ্য।

সময়ই যদি হবে না আসবার তো কাল সন্ধ্যায় দরকার ছিল কি বলবার যে,—'রম্ভা, তোমার হাতের জয়পুরী খাবার খাব কাল বিকেলে?' দরকার ছিল কি বলবার যে,—'রম্ভা, খাওয়ার পর ঐ দক্ষিণের জল-টুঙ্গী ঘরে বোসে একটা 'চৈতী' শুনবো তোমার গলায়?'

: বেজায় খিদে পেয়েছে রত্না।

চমকে উঠে পেছন ফিরে রত্না দেখে দর্প এসে দাঁড়িয়েছে কখন্ পেছনে। আশ্চর্য্য,—এই দেরীর জন্যে মুখে এতটুকু অনুতাপের চিহ্ন নেই তার। বেহায়ার মতো হাসছে!

: খাবার কৈ?—দর্প আবার বলে।

: ফেলে দিয়েছি।—রত্নার সোজা উত্তর।

: সব?

: সব।

: তাহলে খাওয়া বাতিল। চলো, গানটাই শুধু শুনি জলটুঙ্গী ঘরে বোসে।

কী এ লোকটা! রাগ কোরে রত্না বললো খাবার ফেলে দিয়েছে,—আর সে কিনা তাই বিশ্বাস কোরে বসলো? অত কষ্ট করে তৈরী, ফেলে দেওয়া যায় নাকি তা?

: খাবার ফেলিনি।

: তাহলে দাও এনে।

বাঃ! বেশ তো লোকটা। এখনও একটু অপরাধীর আবেদন নেই কণ্ঠে? যেন কিছুই হয়নি। যেন দেরিটা কিছুই নয়। যেন রত্না বাঁদীর মতো বোসে আছে, যখন হোক্ এসে দয়া কোরে খাবারটা খেতে চাইলেই রত্না একেবারে কৃতার্থ হয়ে যাবে।

: খাবার সব চাকর-দাসীদের খাইয়ে দিয়েছি।—রত্না মুখ ঘুরিয়ে বলে।

: অতি উত্তম কাজ করেছ। কিন্তু রত্না, সকল ভৃত্যের প্রতিই [illegible] সমান নজর থাকা উচিত।

: মানে ?

: সকল ভৃত্যই তোমার হাতের অমৃতের আস্বাদ পেল, কিন্তু একটি বান্দা বাদ গেল কেন ?

: কে ?

: তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সেই বেওকুফ্‌ !

ছিঃ ! এ কী রসিকতা।—এ লোকটার দোষ কোরে হাসতেও বাধে না ; আবার বান্দা বলে মাথা হেঁট করতেও সময় লাগে না এক তিল ? আশ্চর্য্য মানুষ !

: লজ্জা করে না, এইসব যাচ্ছেতাই কথা বলতে ?—রত্না নিজে বাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায় : বেহায়া কোথাকার !

: স্বীকার করলুম।—মুচ্‌কি হাসি দর্পর মুখে : কিন্তু বেহায়ার ক্ষিধে-তেষ্টা পায় না, এমন কথা কোথায় শুনেছ রত্না ?

: নির্লজ্জ !—হেসে ফেলতে বাধ্য হয় এবার রত্না : এসো ভেতরে।

আঁচল ধরে টানে দর্প : এই খানেই আন না রত্না, এই ফোয়ারার ধারে ? আপত্তি আছে ?

: না, না। আপত্তি কিসের ? আনছি।

: আর, সেই সঙ্গে······

দর্প'র কথা শেষ হবার আগেই রত্না হেসে বলে : জানি। আম্‌লকির আচার। তাও আনছি।

রত্না চলে যায়। শ্বেতপাথরের ফোয়ারার চত্বরে বসে থাকে দর্প। একলা বসে মনটা তার ভেসে গিয়েছিল কোথায়, কানের কাছে হঠাৎ যেন বিস্ফোরণ হল : আরে, খোকাবাবু না ?

চম্‌কে উঠে দর্প দেখলে ভুবনপুরের বৃদ্ধ ঘটকঠাকুর কখন্ এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পিছনে।

দর্পর পাশেই ফোয়ারার চত্বরে বসতে বসতে ঘটকঠাকুর ততক্ষণে তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন সুরু করে দিয়েছেন : এমন সময় একলা এখানে বসে যে বাবা ?

: এই এমনি,—এমনি বসে আছি।

তালি-মারা ছাতাটি এবং লাল খেরো-বাঁধানো রোকড়-বহি ধাঁচের খাতাটিকে পাশে গুছিয়ে রাখতে রাখতে মসি-বিনিন্দিত দন্তপঙ্‌ক্তির শোভা বিকীরণ কোরে মুখব্যাদান করেন ঘটকঠাকুর : অ্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা ?

ঘটকঠাকুরের মুখের প্রশ্নসূচক অক্ষরটি এমন বিদ্‌ঘুটে একটা আওয়াজ করে যে, চম্‌কে উঠতে হয়। ঘটকমশাই বোধকরি এতখানি চীৎকার কোরে এইটেই বোঝাতে চান যে, কতখানি জোরে কথা বললে তবে সেটা তাঁর কর্ণগোচর হয়।

হ্যাঁ, কানে কম শোনেন ঘটকঠাকুর। বেশ কম শোনেন। একবার বাগুইহাটার মুখজ্যেবাড়ীর বড়কর্ত্তা তো চটেই আগুন হয়েছিলেন ঘটকঠাকুরের ওপর। ঘটকঠাকুর বুঝি বলেছিলেন অমুক দিন অমুক সময় তাঁর মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। মুখুজ্যেদের বড়কর্ত্তা খাবার-দাবারের উদ্যোগ আয়োজন করে মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে বসে আছেন তো বসেই আছেন,—না আসে

ঘটক না আসে ছেলের বাড়ীর কেউ! বড়কর্ত্তা তো অগ্নিমূর্ত্তি!

তের দিন পর ঘটকঠাকুর দিব্যি নির্ব্বিকার ভাবে মুখুজ্যেদের অন্দরে ঢুকে—'তোমার বাড়ীতে পেসাদ পেতে এলুম গো গিন্নীমা'—বলে যেই না চেঁচিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখুজ্যেদের বড়কর্ত্তা একেবার রূপোবাঁধানো লাঠি উঁচিয়ে এসেছেন তেড়ে: বেরোও, বেরোও বাড়ী থেকে।

কাঁচুমাচু মুখ ঘটকঠাকুরের: গরীবের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন বাবু?

: অপ্রসন্ন?—কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না, তারা শুয়োর। অন্দরের উঠোনে আমি শুয়োর সেঁধুতে দেব না।

কথাটাকে বার পাঁচেক বলবার পর তবে ঘটকঠাকুরের কানে ঢোকে এবং শুনে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি: শুধু শুয়োর কি বলছেন বাবু, তারা ডুম্‌নি-মাঠের শুয়োর। (ডুম্‌নিমাঠে বাগুইহাটার গ্রামের লোক প্রাতঃকৃত্যের প্রধান কাজটা সমাপন করে!) তাদের অন্দরে কেন, বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিতে নেই বাবুমশাই। কিন্তু, আমি কবে কথার খেলাপ করলুম?

: করোনি? সেদিন বলে যাওনি তুমি যে, মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা রইল?—রেখেছিলে সে কথা?

: আমি বলেছিলুম?—আকাশ থেকে পড়েন ঘটকঠাকুর।

: তবে কি মিথ্যেকথা বলছি আমি? চেঁচিয়ে ওঠেন মুখুজ্যেদের বড়কর্ত্তা।

এক হাত জিভ্ কাটেন ঘটকঠাকুর: আজ্ঞে সে কি কথা, তাই কি হয়?

: তবে ?

: তাহলে বলেছিলুম নিশ্চয়ই। মাথাটিকে নুইয়ে হাতদুটি জোড় করে একান্ত বিনীত ভাবে বলে উঠলেন ঘটকঠাকুর : কিন্তু জানেনই তো কালা মানুষ আমি। নিজে কি বলেছি, তা' নিজেই শুনতে পাইনি। শুনতে পেলে এমন অন্যায় করি কখনো বাবু ?

শোনা যায়, ঘটকঠাকুরের কৈফিয়ৎ শুনে সেদিন মুখুজ্যেদের বড়কর্ত্তা এমন উচ্চস্বরে হেসেছিলেন যে, বাড়ীর সবাই ছুটে এসেছিল।

গল্পটা কতদূর সত্য তা ঠিক জানা নেই। তবে, ঘটকঠাকুর যে কানে রীতিমত কম শোনেন এটা নির্জ্জলা খাঁটি কথা। বয়েসটা তাঁর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চুয়াত্তর হয়েছে। মাথায় চক্‌চকে টাক। শুধু কানের ওপরে দু'পাশের ঘাড়ে আছে কিছু চুল। অনেকগুলি সন্তান নষ্ট হয়ে একটি সন্তান জীবিত থাকলে সেটি যে রকম আদর পায় বাপ-মায়ের কাছে, ঠিক সেই আদরে ঐ ঘাড়ের দু'পাশের চুলের পরিচর্য্যা করেন ঘটকঠাকুর। মন খারাপ হয় শুধু ঐ চুল নাপিতের কাছে গিয়ে ছাঁটবার সময়।

টাকের জন্যে নাপিতের পো একটি পয়সাও মজুরি কমায় না।

এ হেন ঘটকঠাকুর ফোয়ারার চত্বরে দর্পর প্রায় পাশটিতে দিব্যি গ্যাঁট্ হয়ে বসতেই দর্প দু-তিনবার কেশে নিয়ে ঠিক করে নিলে গলাটাকে। কেননা, প্রশ্ন ঘটকঠাকুর করবেনই, এবং তার উত্তরটা একটু বিশেষ রকমের জোরেই দিতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য্য।—কোন রকম প্রশ্নই আর করলেন না ঘটক ঠাকুর। কিছুক্ষণ এক মনে পা নাচালেন। তারপর নাসিকা-গহ্বরে

কিঞ্চিৎ নস্য প্রবেশ করিয়ে চুপ্‌চাপ শরীরের মধ্যে নস্যের ক্রিয়া অনুভব করতে লাগলেন নিমীলিত চক্ষে। এই অবসরে ঘটক ঠাকুরের পাশ থেকে সরে পড়ায় মতলোবে দর্প সবেমাত্র নাগ্‌রায় পা গলিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক হাঁচি!

বসে পড়তে হল দর্পকে অগত্যা।

উড়ানির খুঁটে নাক মুছে, শূন্য নাসিকা গহ্বরে আরো খানিকটা নস্য গুঁজে ঘটকঠাকুর আপন মনেই বলে উঠলেন: কত্তার কাছে এইছিলুম।

দর্পকে তার উত্তরে কিছু বলতেই হয়। মৃদুকণ্ঠে দর্প বলে: বেশ।

: য়্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা?

: বলছি, বে-এ-এ-এ-শ।

লাফিয়ে ওঠেন ঘটকঠাকুর: নানা বেশি দিন নয়, বেশি দিন নয়, খুব শিগ্‌গিরই তোমার বিয়েটা লাগিয়ে দোব।—তোমরা যেমন চার পুরুষ ধরে এই জমিদারী চালিয়ে আসছো, আমরাও তেমনি তিন পুরুষ ধোরে ঘটকগিরি করে আসছি। বেশিদিন মোটেই লাগবে না। আরে, বড়হুজুর বললেন তো সবে সাতদিন আগে। তিন তিনটে মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল।

খুব একটা কাঁচুমাচু মুখ কোরে দর্প ফস্ কোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে: যাঃ!

ঘটকঠাকুর আশ্বাস দেন: আরো তিন হাজার পাত্রী এখনও আছে আমার এই খাতায়। ভয় কী?

মুখে একটা হাসিখুশী অথচ লজ্জা-লজ্জা ভাব ফুটিয়ে তুলে দর্প বলে: তার ভেতর থেকে আমার জন্যে কোন্‌টি হাতছাড়া করছেন ঘটকমশাই?

: কি বললে ? তোমার জন্যে ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: কামারহাটির চক্কোত্তিদের মেয়েটি তো আর চলবে না।—আফশোষের সুরে বলেন ঘটকঠাকুর।

: কেন ?—শুনে খুব যেন মুষড়ে পড়েছে দর্প।

: তার নাসাগ্রে একটি তিল আছে। নৈলে সে যাকে বলে একেবারে উর্ব্বশী।

: আহা! ঐ একটি তিলের দোষে উর্ব্বশী থেকে মেয়েটি একেবারে ধপাস্ কোরে নেমে তিলোত্তমা হয়ে গেল, না ঘটকমশাই ?

রসিকতাটা ঘটকঠাকুরের ধরবার কথা নয়। তাছাড়া কী যে তিনি শুনলেন, তিনিই জানেন। খুব একটা দুঃখিত মুখ কোরে বললেন : হ্যাঁ, আর বলো কেন।—তারপর ধরো গিয়ে ভূষণার কেষ্ট গাঙ্গুলীর মেজ মেয়ে,—সেও চলবে না।

: কেন ? তার কি কর্ণাগ্রে তিল আছে ?

কথাটা কর্ণ সম্বন্ধীয় বোলেই বোধ করি চট্ কোরে ঘটকঠাকুরের কানে পৌঁছায় না। কানটাকে এগিয়ে নিয়ে আসেন দর্পর মুখের কাছে : য়্যা-অ্যা-অ্যা ?

: বলছি, তার আবার খুঁৎটা কোথায় ? চোখ কানা ?

: আরে রামচন্দ্র !

: ঠ্যাং খোঁড়া ?

: কী যে বলো বাবাজী।

: তোৎলা ?

: ছি-ছি-ছি। একেবারে মধুকণ্টকী যাকে বলে।

: মধুকন্টকী ?

: হ্যাঁ গো। কণ্ঠে মধু যেন কে ঢেলে দিয়েছে, এমনি মিষ্টি গলার আওয়াজ!

: ওঃ মধুকণ্ঠি হেসে ওঠে দর্প ঘটকঠাকুরের ভাষাজ্ঞান দেখে।

হাসিটা ভাল লাগে না ঘটকঠাকুরের। বলেন : ঐ হোল।

: তা' তবে আবার খুঁৎটা কোথায় ঘটকমশাই ?

: বড্ড খুঁৎ।

: বংশের কিছু···?

: কি বললে ?—কথাটা ঘটকঠাকুর শুনতে পেয়েছেন মোটামুটি। তবু আরো একটু নিশ্চিন্ত হতে চান।

: বলছি, বংশের কিছু—?

এইবারে চটে কাঁই হয়ে ওঠেন ঘটকঠাকুর। তেড়ে ফুঁড়ে লাফিয়ে ওঠেন প্রায় : ভূষণার গাঙ্গুলীদের মতন সদ্বংশ আর একটা বার করো দিকিনি এই বাংলা দেশে!

তারপরেই গলাটা একটু খাটো কোরে বলেন : এক এই তোমাদের ছাড়া।

: তবে আবার খুঁৎটা কোথায় ?—দর্প এবার সত্যিই ভারী হত-ভম্ব হয়ে যায়। ঔৎসুক্য জন্মায় তার খুঁৎটা জানবার জন্যে।

: খুঁৎ ?—ঘটকঠাকুর মুখখানাকে এমন বিকৃত করেন, যেন মনে হয় খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গোবর মাড়িয়ে ফেলেছেন : আর বোলো না।—খুঁতের কথাটা বলতেও যেন ঘেন্না করে ঘটকঠাকুরের : গেল জ্যৈষ্ঠে তার বিয়ে হয়ে গেছে!

অট্টহাসিতে বাগান মুখর কোরে তোলে দর্প : এই খুঁৎ হোল ?

সে হাসিকে চাপা দিয়ে ঘটকঠাকুর চীৎকার কোরে ওঠেন : খুঁৎ নয় আবার?—ঐ বিয়েটি যদি না হোত, তাহলে এই রায়বাড়ীতে ও-মেয়ের বিয়ে আট্‌কাক তো দেখি কার বাপের সাধ্যি!

: তা সত্যি।—কোনরকমে হাসি থামিয়ে যথাসাধ্য গম্ভীর মুখ কোরে দর্প বলে।

: তা ভেব না বাবাজী।—আশ্বাস দেন ঘটকঠাকুর : আর একটি মেয়ে আমার হাতে আছে।

: নিখুঁৎ?—

: একেবারে।

: কি রকম?—কি রকম?—দর্প ঘেঁষে এসে বসে ঘটকঠাকুরের কাছে। আগ্রহের ভাব না দেখালে ঘটকঠাকুরের সঙ্গে মজাটা হবে কি কোরে?

ঘটকঠাকুর চক্ষু বুজে মেয়ের রূপবর্ণনা সুরু করেন : সে মেয়ে হাসলে ঝরে মাণিক,—কাঁদলে পড়ে মুক্তো।

দর্প ততোধিক গদগদকণ্ঠে পদ মিলিয়ে দেয় : আর, হাঁচলে ঝরে সর্দ্দি—কাশলে খায় সুক্তো।

ঘটকঠাকুর চাপড় মারেন নিজের উরুতে : তুমি সব জানো দেখছি!—দেখেছ নাকি মেয়েকে?

মনে করিয়ে দিতে হবে না নিশ্চয়ই যে, ঘটকঠাকুর কানে কম শোনেন।

এর পর মেয়ের বাপের নাম, বংশ-পরিচয়, জমিদারীর আয়, মেয়ের কাকা কি করেন, প্রপিতামহ কোন্ নবাবের তহশীলদার ছিলেন, মেয়ের মায়ের মাস্‌শাশুড়ী কোন্ জমিদারীর রাণী ইত্যাদি

অবশ্য জ্ঞাতব্য সব তথ্যের ফর্দ্দ দাখিল করেন ঘটকঠাকুর। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে যায় দর্প সমস্ত কিছু।

ঘটকঠাকুর বলেন: হুজুরের সঙ্গে এইমাত্র এই সব কথা কয়েই তো ফিরছি। নায়েবমশাই বোধ হয় বুধবারে মেয়ে দেখতে যাবেন।

: তাই নাকি?—দর্প এমনভাবে উচ্চারণ করে কথাটা, যেন আনন্দ আর ধরছে না তার।

: শুনে কেমন লাগছে বাবাজী? আনন্দ হচ্ছে?—ঘটকঠাকুর আবার একটি চাপড় মারেন নিজের উরুতে!

: বেজায়!—দর্প লজ্জা-লজ্জা মুখে করে।

: তাহলে বলি বাবাজী।—ঘটকঠাকুর ঘেঁসে আসেন দর্পর কাছে: আমার যখন প্রথমবারের বিয়ের সম্বন্ধটা আসে…

কিন্তু সম্বন্ধ আসার আগেই দর্পর প্রশ্ন আসে: আপনার ক'টি বিয়ে ঘটকমশাই?

: সাতটি।—শোনোই না আগে ব্যাপারটা। প্রথমবারের বিয়ের সম্বন্ধটা যখন আসে, তখন বলবো কি, আনন্দে সাতকড়িকে আমার ড্যাংগুলি খেলার কাঠিগুলো সব দানই করে ফেললুম।

: তখন আপনার বয়েসটা?—বিনীত প্রশ্ন দর্পর।

: এগারো।—তোমার মত বয়েসে ঘরে আমার চতুর্থপক্ষ আলো কোরে এসেছেন!

ইতিমধ্যে খাবারের প্লেট নিয়ে রত্না এসে পড়ে। দূর থেকে ঘটকঠাকুরকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। হাতের ইসারায় দর্পকে বলে: তাগাও।

দর্প ঘাড় নেড়ে ঘটকঠাকুরের দিকে কানটাকে এগিয়ে নিয়ে বলে : য়্যাঁ-অ্যা-অ্যা ?

কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে হয় ঘটকঠাকুরকে : বলছি কি যে, তখন ঘরে আমার চতুর্থপক্ষ আলো কোরে এসেছেন।

: বর্ত্তমানে ঘর আলো করছেন যিনি ?

: সপ্তমপক্ষ।

: কিন্তু এটা যে কৃষ্ণপক্ষ, সে খেয়াল আছে ঘটকমশাই ?—অন্ধকার হয়ে এল যে।

: এই রে! লাফিয়ে ওঠেন ঘটকমশাই। রাতে চোখে কম দেখেন তিনি। খড়মে পা গলাতে গলাতে শঙ্কিতকণ্ঠে বলেন : তার ওপর আমার এটি আবার ভয়ানক বদ্‌রাগী। চলি বাবাজী।

: আসুন।

ঘটকঠাকুরের খড়মের শব্দটা দূরে চলে যেতেই রত্না আসে রেকাবী নিয়ে : খাবার সব আনছে চারুদাসী। ততক্ষণ এই নাও তোমার আচার।

: আর আচার। আচারের চেয়েও মধুরতর জিনিষে পেট একেবারে ভরপুর হয়ে গেল এইমাত্র।—পা নাচাতে নাচাতে আকাশের দিকে চেয়ে বলে দর্প।

: কি ?

: সমাচার।

: কিসের ?

: তার পটলচেরা চোখ, দুধে আলতায় রং, মেঘের মতন চুল।—

সে হাসলে ঝরে পান্না, কাঁদলে পড়ে মুক্তো, আর হাঁটলে ফোটে পদ্ম।

এই অবধি বোলে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নেয় দর্প রত্নার দিকে। তারপর আবার বলে : বাপের একমাত্র মেয়ে, অন্য ছেলেপুলে নেই, শিবগঞ্জে বিরাট জমিদারী।—কুষ্ঠীর মিল রাজযোটক।

: রঙ্গ ভাল লাগছে না কিন্তু দর্প।—রত্না মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়।

: সত্যি। ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে আমার।

: ভালই তো।

: এই অঘ্রাণেই বোধ হয় লাগবে।

: বেশ তো।

: নায়েব মশাই বোধ হয় বুধবার মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন শিবগঞ্জে।

: ও।

: বাবা বলেছেন নায়েব আগে দেখে আসুক,—তারপর একদিন গিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরে আসা যাবে এখন।

: বেশ তো।

এইবার হেসে ওঠে দর্প : বেশতো, ভালই তো, আর ও' ছাড়া তো মুখ দিয়ে আর বাক্যি বেরুচ্ছে না রতনবাঈ-এর।

: ছাই।

: ছাই? শুনতে তোমার খুব ভাল লাগছে?

: খু-উ-ব।

হঠাৎ কি হয়,—আর কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। আবহাওয়াটা হাল্কা থেকে নিমেষে ভারী হয়ে ওঠে,—কেমন থম্‌থমে হয়ে যায়। অন্ধকার নেমে আসে একটু একটু কোরে। ঝিঁঝি পোকার ডাকে কেমন যেন অলস-বিষণ্ণতা। দর্প আর রত্না নীরবে বোসে থাকে ফোয়ারার বেদীর ওপর জলের দিকে মুখ কোরে। রায় বাড়ীর অষ্টভূজার মন্দিরের নহবৎখানা থেকে সন্ধ্যার সানাই বেজে ওঠে—পূরবীতে। ভারী করুণ তাব সুর।

দর্পর কেবলই মনে হয়,—আহা, তার পাশের ঐ নতমুখী রত্না কেন ঐ শিবগঞ্জের মুখুজ্যেদের বড় তরফের একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মালো না? সেই মেয়ে, যার সঙ্গে তার কুষ্ঠীর মিল রাজযোটক? —বেশ হোত, বুধবার নায়েবমশাই রত্নাকেই যেতেন দেখতে। এসে বলতেন, পরমাসুন্দরী মেয়ে। তারপর বাবা একদিন ধান দূর্বা··· আর···আর দর্পর মায়ের হাতের হাঙরমুখো কঙ্কন দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসতেন রত্নাকেই। তারপর, সানাই বেজে উঠতো একদিন রায়েদের নহবৎখানায়। আলো জ্বেলে বাজনা বাজিয়ে বরকন্দাজ নিয়ে দর্প যেত ঐ রত্নাকেই বিয়ে করতে। রত্নার শাড়ীর আঁচলের সঙ্গে দর্পর গরদের চাদরের গাঁটছড়া বাঁধা হোত।—বাসরে সবাই যখন রত্নার ঘোম্‌টা তুলে ধোরে বলতো,—ও বর, কনের মুখ দেখসে;—দর্প হেসে বলতো, ও মুখ আমার অনেক দিনের দেখা!

এমন স্বপ্ন বাঈমহলের মেয়ে রত্নাও দেখে মাঝে মাঝে। এ-জীবনে যা কোনদিন হবার নয়, তারই স্বপ্ন।

নীরবতা ভঙ্গ কোরে দর্প হঠাৎ বোলে ওঠে: বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারবোনা রতন,—কিছুতেই না। বাঈমহল আর খাস্‌মহলের টানা-পোড়েন আমার পূর্ব্বপুরুষদের সইলেও আমার সইবে না। আমার জীবনে না হয় শুধু বাঈমহলটাই থাকুক।

: ছিঃ!—রত্নার ছোট উত্তর।

: ছিঃ কিসের রতন? আমার তুমি আছ।

: তাই কি হয়?

: কেন হবে না?—আমি যদি অবিবাহিতই থাকি চিরদিন?

: তোমাদের বংশ?

: কিন্তু বিয়ে কোরে আনবো যাকে, তার প্রতি অবিচার করবো যে!

: অবিচার করবে কেন?—তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা সবাই তো দু-মহলের প্রতিই সুবিচার করে এসেছেন। তুমিই বা পারবে না কেন? নাও রেকাবীটা ধরো। আমি দেখি, চারুদাসী এত দেরী করছে কেন।

রত্না পালিয়ে যায়। শুধু দর্পর কাছ থেকেই নয়, নিজের কাছ থেকেও নিজেকে পালিয়ে নিয়ে যায় যেন। কিন্তু এমন কোরে চিরদিন নিজের কাছ থেকে নিজেকে পালিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারবে তো রত্না?

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে দর্পকে ঘিরে।

ভুবনপুর থেকে গৌরগঞ্জ আট ক্রোশ পথ। এই আট ক্রোশ পথের শেষে রক্ষিতদের বাড়ী। ছোটখাটো সাধারণ দোতালা পাকা বাড়ী। তারই একতালার কোনের ঘরের লোহার সিন্ধুকে ও-অঞ্চলের অনেকেরই ভদ্রাসনের দলিল-পাটা বন্ধক আছে।

সেদিন সকালে কেশব রক্ষিত যথারীতি খাটো একখানি পাছা-পেড়ে শাড়ী পরে তামাক খাচ্ছিলেন আর কাশছিলেন। কাশির দমকে যথারীতি তাঁর পাঁজরার হাড়গুলো হাপরের মতো ওঠা-নামা করছিল। কিন্তু তাতে কাজের ব্যাঘাত হয়নি কিছু। এর মধ্যে তিনকড়ির সুদের টাকা নিয়েছেন, গোবর্দ্ধনের চোখের জলে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে তাকে শাসিয়েছেন সাতদিনের মধ্যে টাকা শোধ করতে, গদাধর টাটুজ্যের বিধবাকে দিয়ে কি একটা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছেন।

এতগুলি সৎকর্ম্ম কোরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন রক্ষিত মহাজন, পঞ্চানন দাস কাঁদো কাঁদো গলায় বললে : আমার সুদের টাকা ক'টা দু'দিন পরে দিলে হবে না কত্তা ?

জিরোনো আর হয়না রক্ষিত মহাজনের। পাঁজরার হাড়গুলোকে কেমন একটা কায়দা কোরে আঁট কোরে জোর একটা কাশির দমক্ আটকে নিয়ে কেশবরক্ষিত নিতান্তই শান্ত কণ্ঠে বলেন : উপায় নেই বাবা পঞ্চানন। সামনের পূর্ণিমেয় সত্যনারায়ণের পূজো দেবার সাধ হয়েছে বৌমার। তা' দুটো সিন্নি-বাতাসা যে করবো, হাতে পয়সা নেই। তাই বাধ্য হয়েই ডেকে পাঠাতে হোল তোকে।

পঞ্চানন বিনীত কণ্ঠে শুধু বোঝাতে গেছলো যে,—সারা এই

গৌরগঞ্জ মহকুমার মানুষজন মায় গোরু-ছাগলটাকে পর্য্যন্ত সিন্নি-বাতাসা বিলোবার মতো পয়সা যাঁর ঐ শাড়ীর ট্যাঁকেই গোঁজা থাকে সদাক্ষণ, পঞ্চাননের মতো দিন-দরিদ্রের সামান্য কটা সুদের টাকা ক'দিনের জন্যে তিনি অনায়াসেই মাফ. কোরে দিতে পারেন।

কথাটা শুনেই কঠিন হয়ে ওঠেন কেশব রক্ষিত।

কিন্তু বক্তব্যকে সোজা পথে প্রকাশ না কোরে বেঁকিয়ে প্রকাশ করাই কেশব রক্ষিতের স্বভাব। হিসাব রক্ষক নটবর একমনে হিসেব কষছিল, তাকেই সাক্ষী মানেন কেশব রক্ষিত : ওহে নটবর, শুনছো পঞ্চাননের কথা? মুখের ওপর ঠকাস্ কোরে বলে দিলে যে আমি একটা পাঁড় মিথ্যেবাদী। তেমন তেমন মহাজন হোত, জুতিয়ে ছিঁড়ে দিত পঞ্চাননের ঐ বাংলার পাঁচের মতন মুখের চামড়া।

কেশব রক্ষিতের কণ্ঠে উত্তাপ বা উত্তেজনার স্পর্শটুকুও নেই। কিন্তু তাইতেই শিউরে উঠে পঞ্চানন বলে : আজ্ঞে তা বলিনি কত্তা। বললে জিভ্. খসে যাবে আমার। আমি শুধু বলেছি—

আবার হিসাব রক্ষককে সাক্ষী মানেন কেশব রক্ষিত : ওহে নটবর, শুনলে? পাকে প্রকারে পঞ্চানন আমায় বুঝিয়ে দিলে যে, আমি বাংলা কথারও মানে বুঝি না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাই বললে আর কি যে, পাঠশালে তো আর যাওনি সাতজন্মে—পেটে বোমা মারলেও 'ক' বেরোয় না;—পাঁড় মুখ্যু কোথাকার!

একটু থেমে আড়চোখে একবার পঞ্চাননের দিকে দেখে নিয়েই নিতান্তই গোবেচারীর মতো মুখ কোরে কেশব রক্ষিত আবার নটবরকে মধ্যস্থ করেন : কি হে নটবর, মানেটা এই রকমই দাঁড়ালো না?—কি জানি, আমি আবার মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ।

শিয়ালের মত ধূর্ত্ত আর সাপের মতো খল এই লোকটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে পঞ্চানন। সামান্য সোজা কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বাঁকা কোরে তুলতে জোড়া নেই লোকটার। কাজেই কথা না বাড়িয়ে পঞ্চানন পায়ে হাত দেয়: আর দুটো মাস কত্তা, দুটো মাস সময় দেন। ধান তোলার সময় হয়ে এসেছে। আমার বড় ছেলে হারাণ লিখেছে, সেও মাস দুয়েকের মধ্যেই সহর থেকে ফিরবে তার রোজগারের টাকা নিয়ে। তখন একেবারে অনেকখানি মিটিয়ে দেব।

: সকলেই অমন দূরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে মিটিয়ে দেব, মিটিয়ে দেব।—কিন্তু শেষ অবধি দেয় কৈ ?

পঞ্চানন বলে : সকলের কথা জানি না কত্তা ; আমার কথা তো জানি। তুমি কি মনে কর কত্তা, দেনা ফেলে রাখি আমরা সাধ করে ? দশটাকার দেনা শোধ করতে পারি না সময়ে,—সুদের পর সুদ বেড়ে সেই দেনা দাঁড়ায় একশো টাকায়। সে কি আমাদের সাধ ?—দু মাস বাদে কেন, যদি পারি তার আগেই চেষ্টা করবো সুদ ছাড়া আসলেরও কিছু শোধ করতে।

পঞ্চানন তার আটবছরের ছেলে গোপ্‌লার মাথায় হাত রাখে: এই আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলছি আজ্ঞে।

হুঁকোর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখখানাকে বেঁকিয়ে রক্ষিত মহাজন আবার নটবরকে সাক্ষী মানেন : মা ষষ্ঠীর কৃপায় পঞ্চাননের আমার সাত সাতটি ব্যাটা-বেটি। ও একটা গেলেই বা ওর কিই বা এসে যায় ;—কি বল নটবর ?

শিউরে ওঠে পঞ্চানন। উত্তেজনায় থরথর কোরে কাঁপতে থাকে

ওর সর্ব্ব শরীর : কি বললে ! কি বললে তুমি কর্ত্তা !—তুমি কি বলতে চাও ব্যাটার মাথায় হাত দিয়ে আমি মিছে কথা বলছি !

কেমন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় যেন কেঁপে ওঠে বাপের প্রাণ। পঞ্চানন গোপ্‌লাকে জড়িয়ে ধরে। যেন আড়াল করতে চায় কটুভাষী রক্ষিতমহাজনের অমঙ্গুলে কথার বিষবাণ থেকে। তাতেও যেন ঠিক ভরসা হয় না ! ছেলের কানে কানে বলে : গোপ্‌লা তুই বাড়ী যা বাবা, এখানে আর থাকিস নে রে।—এক ছুটে দৌড়ে চলে যা বাড়ী। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।—হাটের ভেতর দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যাস্ রে ;—য়্যাঁ ? আর যাবার পথে পীতেম্বরের দোকান থেকে দুটো বড় বাতাসা চেয়ে নিয়ে খেতে খেতে যাস ; বলিস্ আধলা পয়সা বাবা দিয়ে যাবেখন।

রক্ষিতমহাজনের দৃষ্টির সামনে থেকে গোপ্‌লাকে জোর কোরে সরিয়ে দিয়ে পঞ্চানন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে তবু। তারপর শক্ত কঠিন মুখে রক্ষিতের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় বলে : শোন কর্ত্তা, ব্যাটার মাথায় হাত দিয়ে মিছে কথা বলে না বাপেরা। ছমাসের মধ্যে সুদে আসলে তোমার সমস্ত টাকা শোধ দেব। তার জন্যে ঘটি বাটি বেচে যদি সকলকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হয়, সেও স্বীকার।

ধূর্ত্ত শিয়ালের চোখে দুষ্টুমীর ছাপ ফুটে ওঠে। অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বলেন : মিছে রাগ করিস বাবা পঞ্চানন। আরে বাপু, বুদ্ধি-শুদ্ধি খেলিয়ে চেষ্টা চরিত্তির করলে টাকাটা কি আর জোগাড় হয় না ?—এইটুকু বোলে রক্ষিত নটবরের দিকে ফেরেন। এবং মুখখানাকে অত্যন্ত ভালমানুষের মতো কোরে বলেন : পঞ্চাননের বৌমা, মানে ঐ হারাণ ছোঁড়ার বৌটার রূপের বেশ চটক আছে,—কি বল নটবর ?



পঞ্চাননের রক্তে আগুন ধরবো ধরবো করে। কঠিন কণ্ঠে শুধু বলে : কী বলতে চাও ?

রক্ষিতমহাজন তেমনি শান্ত কণ্ঠে বলেন : না, এইমাত্র তুই বলছিলি না যে, ঘটিবাটি বেচে 'সকলকে' নিয়ে পথে দাঁড়াবি,—তাই ভাবছিলুম···

এই অবধি বোলেই রক্ষিতমহাজন হঠাৎ থেমে গিয়ে নিতান্তই শান্তভাবে হুঁকোয় মুখ দেন।

: কী ভাবছিলে ?—চীৎকার কোরে ওঠে পঞ্চানন। আর ধৈর্য্য নেই তার।

: ভাবছিলুম,,সকলকে নিয়ে পথে না দাঁড়িয়ে, তোর ঐ হারাণ ছোঁড়ার বৌটাকে একা পথে দাঁড় করালেই···

আর কিছু বলবার আগেই বাঘের মতো গর্জ্জন কোরে ওঠে পঞ্চানন : রক্ষিতকত্তা !

কিন্তু রক্ষিত তো জানেন, যতই গর্জ্জন করুক ও হচ্ছে খাঁচার বাঘ, দেনার খাঁচায় আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। তাই নিতান্তই অনুত্তেজিত কণ্ঠেই বলেন : দেনাটা তাহলে তোর পনেরো দিনেই সুদে আসলে সব শোধ হয়ে যেত পঞ্চানন।

খাঁচার বাঘ ক্রোধে এবার খাঁচার শিক ভাঙ্গে বুঝি ! পঞ্চানন গর্জ্জে ওঠে : ফের ও কথা মুখে আনলে জিভ ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে দেব।

পঞ্চানন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। হাত পায়ে কেমন যেন রক্ত ফুটতে সুরু করেছে তার। এখানে থাকলে রাগের মাথায় কখন্ কি কোরে বসবে শেষকালে।

রক্ষিত হাঁক পাড়েন : তেজ দেখিয়ে চলে গেলেই তো আর হয় না বাবা পঞ্চানন। টাকাটার কথাটা একটু ভেবে দেখতে হয় যে।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায় পঞ্চানন : ভেবে দেখেছি। টাকা তুমি পাবে কত্তা, আমার ব্যাটার নাম নিয়ে দিব্যি খাচ্ছি,—সাতদিনের মধ্যে তোমাকে সুদে আসলে সব টাকা শোধ কোরে দিয়ে যাব। না দিতে পারলে যেন গোপ্লার মরা মুখ দেখতে হয় আমাকে।

পঞ্চানন আহত সিংহের মতো ফুলতে ফুলতে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

অবাক্ হয়ে যান্ রক্ষিত। সাতদিন? সাতদিনেই সব চুকিয়ে দেবে পঞ্চানন? কেমন কোরে? কোথায় পাবে সে এত টাকা?

পঞ্চাননেব বাপ-ঠাকুর্দ্দা ছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে। হরিশ ঠ্যাঙ্গাড়ের ছেলে ভবিচরণ, তারই ব্যাটা পঞ্চানন। হরিশ ঠাঙ্গাড়ের নাতির ঘরে আজো সে-দিনের সোনা দানার কুচো কিছু লুকোনো আছে নাকি? নৈলে এতবড় দিব্যিটা পঞ্চানন নিলে কোন সাহসে? চক্চক কোরে ওঠে রক্ষিতের সাপের মত চোখদুটো।

বাড়ীর ভেতর থেকে তাগাদা আসে, চানের তেল-গামছা পুকুর ঘাটে রাখা হয়েছে,—বেলা অনেক হ'ল।

হোক বেলা। কাজ—এখনও অনেক বাকি রক্ষিতের। ভুবন-পুরের রায়বাড়ী থেকে আবার চিঠি এসেছে।—কিছু টাকার দরকার। অনন্তনারায়ণ ছেলের বিয়ে দেবেন নাকি শীগগিরই। তাঁদের পদ্মতলা আর গৌরহাটি মহালের পাটা বন্ধক দিয়ে টাকা চেয়ে

পাঠিয়েছেন। আর কদিন পরেই ভুবনপুরের সরকার এসে পড়বেন হয়তো পাল্কীতে। টাকাগুলো তাড়া বেঁধে গুছিয়ে রাখতে হবে ভাল কোরে।

হিসাবরক্ষক নটবরকে কাজের ছুতোয় বাইরে সরিয়ে দিয়ে ঘরে খিল্ লাগিয়ে সিন্ধুকের চাবি খোলেন রক্ষিত মহাজন।—সিন্ধুকের মধ্যে দৃষ্টি গিয়ে পড়তে রক্ষিত নিজেই যেন চমকে ওঠেন। কম ঐশ্বর্য্য তো নয়!

একমাত্র ছেলে নেপাল। মদ খায়,—আনুষঙ্গিক দোষও আছে। তা থাক্। রক্ষিত মহাজনেরও তো সে-দোষের কমতি ছিল না কোন দিন। কিন্তু তাই বলে নিজের পয়সায় মদ খায়নি রক্ষিত কোনদিন। ফূর্ত্তি করেছে, কিন্তু টাকা খসায়নি সে একটাও। নেপালটা কিন্তু ফূর্ত্তি কোরে খরচ করে,—মদ খায় নিজের পয়সায়; ভাবনা যে সেইখানেই। তিল তিল করে তিনপুরুষ ধরে রক্ষিতরা যা গড়ে গেল, নেপাল কি এক পুরুষেই তা ভেঙ্গে ধুলো করে উড়িয়ে দেবে নাকি?

কেমন ভয়-ভয় করতে থাকে রক্ষিত মহাজনের। সিন্দুকের চাবিটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেন।

টাকা-পয়সা,—ও হচ্ছে মুড়ির মতো। যতক্ষণ বন্ধ আছে,—বেশ আছে;—মুচমুচে, কুড়মুড়ে। ও-জিনিষ হাওয়া লাগলেই নেস্কে যায়,—শুকিয়ে যায়,—ছোট হয়ে চুপ্‌সে যায়!

ভুবনপুরের গাঁ ঘেঁষে বয়ে গেছে ফুলেশ্বরী নদী। তারই ওপারে মেলা বসেছে হাটতলার গোঁসাই-মঠের কোলে।

প্রতি বছরই মেলা বসে এমন সময়। বীরভূম বাঁকুড়ার ওধার থেকে আসে সাঁওতালের দল সেই মেলায়। ওদের মেয়েরা এসে পূজো দেয় গোঁসাই-মঠের গোরাঠাকুরের পায়ে, আর পুরোণো কণ্ঠি ফুলেশ্বরীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে নতুন তুলসী কাঠের কণ্ঠি কিনে গলায় পরে। ওদের মরদগুলো ছাগল নিয়ে আসে মেলায়,—বিক্রি করতে।

গোঁসাই মঠের মোচ্ছব চলে সাত দিন ধরে। বাঙ্‌লাদেশের এখান-ওখান থেকে কত মানুষই না আসে। কেউ ধর্ম্ম করতে, কেউ ব্যবসা করতে,—কেউ বা একসঙ্গে দু-কাজ সারতে।

জয়দেব ঠাকুরের পদ গায় কীর্ত্তনীয়ার দল। ঘন ঘন হরিবোলের ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত মেলা। গোঁসাই-মঠের ঘাটে দূর-দূরান্তের নৌকা এসে লাগে।

নানা নৌকার মাঝখানে ওপাশে লেগেছে ভুবনপুরের বা[illegible] লাল-বজ্‌রা সেই কোন্ সকালবেলা থেকে।

প্রতিবছর পিয়ারাবাঈ মেলায় এসে বৈষ্ণব-ভিখারীদের দান কোরে কিছু পুণ্যসঞ্চয় কোরে যান। কীর্ত্তনীয়ারা কেউ পায় ভোট্ কম্বল, কেউ বা বৃন্দাবনী ছাপা নামাবলী, কেউ বা আর কিছু। গোঁসাই-মঠের গোঁসাইজীরা পান প্রণামী। গেল বছরের বাঁশীটির বদলে নতুন আরেকটি সোনার বাঁশরী ওঠে শ্যামসুন্দরের হাতে;

রাধারাণীর নাকে নতুন নথ, মাথায় নতুন মুকুট, দুহাতে নতুন মান্‌তাসা।

এবারেও এসেছেন পিয়ারাবাঈ রম্ভাকে সঙ্গে নিয়ে। রম্ভা এবার প্রথম এলো। আর আছেন বাঈমহলের গঙ্গাপ্রসাদ সরকার মশাই। দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারটা তো তাঁকেই করতে হবে হিসেব করে।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরের পশ্চিমে মস্ত দীঘি শ্যামসায়র। তারি এক পাড়ে ছোটখাটো সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। চারপাশ দরবারী কানাৎ দিয়ে ঘেরা। ভেতরে পিয়ারাবাঈ গঙ্গাপ্রসাদ সরকারের সঙ্গে দানের জিনিষপত্র মিলিয়ে গুছিয়ে রাখছিলেন। রম্ভা একধারে কানাৎ-এর আড়াল সরিয়ে তাকিয়ে ছিল দূরের মেলার দিকে। তালপাতার ভেঁপুর শব্দ,—লোকজনের আনাগোনা,—পাঁপড়ভাজার গন্ধ। রম্ভার কেবলই মনে হচ্ছি, এক ছুটে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে মেলার ভিড়ের ভেতর মিশে যেতে। কিন্তু উপায় নেই।—আব্রু আছে।

সামিয়ানার কানাৎ সরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল রম্ভা,—হঠাৎ একটা কলার খোসা কাঁধের উপর এসে পড়তে চম্‌কে উঠে তাকিয়ে দেখলে তার ঠিক বাঁদিকে দাঁড়িয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে লিক্‌লিকে চেহারার একটি যুবক,—হাতে তার অর্দ্ধভক্ষিত একটি কাঁঠালি কলা, পেছনে তার দু-দুটি ইয়ার-বক্সী।

রম্ভা তাড়াতাড়ি কানাৎ-এর আড়ালে আত্মগোপন করলে।

ছিঃ ছিঃ!—যেমন মানুষটার চেহারা, প্রবৃত্তিটাও কি ঠিক তেমনি। অমন রোগা গাঁটওলা গলা আর অত কোঁচকানো শক্ত-চুল রম্ভা দ্যাখেনি কখনো আগে।

লোকটির নাম নেপাল রক্ষিত। গৌরগঞ্জের রক্ষিত মহাজনের গুণধর পুত্র.

রত্না আত্মগোপন করতেই হাতের কলাটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে নেপাল তার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে ফিয়ে জিজ্ঞেস করলে : কে বলতো ?

সঙ্গীরা বললে : কি জানি। সামিয়ানাটা তো শুনলুম ভুবনপুরের বাঈমহলের। মেয়েছেলেটা যে কে ঠিক বুঝতে পারলুম না। দেখতে কিন্তু একেবারে হুরী রে!

নেপাল বললে : কলজেটা একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল যে বাবা।

চীৎকার কোরে একটা অশ্লীল গানের কলি আওড়াতে আওড়াতে চলে গেল নেপাল ও তার সঙ্গীদ্বয়। তারপর জখম দিল্‌টাকে চাঙ্গা করবার জন্যে ওরা মেলার ভিড়ের সেইদিকটাতে গা ভাসিয়ে দিল, যে দিকটায় সাঁওতাল মেয়েদের দল হাত ধরাধরি করে নাচতে সুরু করে দিয়েছে।

ওদিকে তখন গোঁসাই-মঠের ঘাটে নানা নৌকার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে ভুবনপুরের খাসমহলের সাদা ময়ূরপংখীখানা। কুমার দর্পনারায়ণ এসেছেন শ্যামের মন্দিরে পূজো দিতে।

পূজো দেওয়া শেষ করে প্রসাদ মুখে দিয়ে ময়ূরপংখীতে উঠে পোশাক্ বদল করে দর্প যখন শ্যামসায়রের ধারে পিয়ারাবাঈ-এর সামিয়ানায় এসে হাজির হল, বেলা তখন অনেক হয়ে গেছে।

ধুতি শাড়ী-কম্বল ইত্যাদি সব বিলি করা শেষ করে পিয়ারাবাঈ তখন নবদ্বীপের কীর্ত্তনের আসরে গিয়ে বসেছেন। সামিয়ানায়

আছে শুধু রম্ভা ; আর তাকে আগ্‌লাবার জন্যে প্রৌঢ় গঙ্গাপ্রসাদ সরকার।

সামিয়ানায় ঢুকে রম্ভাকে দেখে চম্‌কে উঠলো দর্প।

: আরে, তুমি !—তুমি এসেছ ?

রম্ভা বললে : হ্যাঁ। কেন আসতে নেই নাকি ?

: এর আগে তো আস নি কখনো,—তাই চমকে উঠেছি।—হঠাৎ ?

: পিসিমা নিয়ে এলেন। বললেন, এখন থেকে সব দেখে শুনে শিখে রাখতে।

: গয়না-টয়না খুলে এলোচুলে গরদের শাড়ী পরে এমন বনবাসিনী-বনবাসিনী বেশ কেন ?

: পিসিমা বললেন যে,—দেবস্থানে সাজতে গুজতে নেই।

দর্প এবার রম্ভার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে : এই আলুগা বেশে তোমাকে কিন্তু আরো চমৎকার দেখাচ্ছে রম্ভা,—সত্যি।

: থামো।

: থাম্‌ছি। কিন্তু এখানকার মেলা দেখেছ ?

: উঁহু।—সামিয়ানা থেকে আমার বেরুনোই মানা। দেখবো কি করে ?

: মানা ? আরে দূর—দেবস্থানে আবার আব্রু বাছলে চলে নাকি ?—চলো মেলাটা দেখিয়ে আনি তোমায়।

পিসিমার বকুনির ভয়ে বার বার 'না' 'না' করতে থাকে রম্ভা। দর্প কোন কথা না শুনে হিড় হিড় কোরে তাকে টানতে টানতে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে মেলার ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

গঙ্গাপ্রসাদ সরকারমশাই সামিয়ানার দোরের কাছটায় দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকেন। আর, মনে মনে ভাবতে থাকেন, রম্ভা আর দর্প ফেরবার আগেই যদি পিয়ারাবাঈ ফিরে আসেন সামিয়ানায়, তাহলে কি বলে তাঁকে শান্ত করবেন।

ওরা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে বকুলতলার বেদীর ধারে। বকুলতলার বেদীর ধারে তখন কয়েকজন বৈষ্ণব আর কয়েকজন বৈষ্ণবীর সামনে একটি তরুণ বৈষ্ণব আরেকটি কিশোরী বৈষ্ণবীর সঙ্গে নিজের গলার কণ্ঠি বদল করছিল। তরুণটি সাঁওতাল,—কিশোরীটিও। ভারী মানিয়েছে দুটিকে। এমন কত তরুণ-তরুণীর মিলনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐ বকুলগাছ কত দিন ধরে!

রম্ভা জিজ্ঞেস করলে: কি হচ্ছে গো ওখানে?

: বিয়ে।

: ওই নাকি বিয়ে? মিথ্যুক।

দর্প বলে: সত্যি রম্ভা। ঐ ছেলেটি এই মুহূর্তে স্বীকার করে নিয়েছে ঐ মেয়েটিকে তার জীবন-সঙ্গিনী বলে। আর মেয়েটিও পেয়েছে তার জীবনসঙ্গী। সাক্ষী ঐ বকুল গাছ।

রম্ভা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বকুলগাছটির দিকে। কথা সরে না মুখে।

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর দল নবদম্পতীকে ঘিরে চলে যায় বকুলতলা ছেড়ে। এবার বুঝি শ্যামসায়রে স্নান করবে ওরা,—তারপর যাবে শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সামনে,—তারপর···?

মেলা দেখা শেষ কোরে পায়ে পায়ে ওরা ফিরে যাবে যে যার

গ্রামে। ফেরার পথে চলতে চলতে হঠাৎ একসময় ঐ নবদম্পতি টের পাবে,—ওরা দুজনেই শুধু আছে,—আর কেউ নেই,—সবাই যে যার ঘরের দিকে বেঁকে গেছে। তখন হয়তো নেমে এসেছে সন্ধ্যা। মেঠো পথের দুধারে বুনো ফুলের গন্ধ। কিশোরীটি এবার ঘেঁষে আসবে তরুণটির কাছে। তরুণ সাঁওতাল তার কালো হাতটি দিয়ে নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে টেনে নেবে মেয়েটিকে। তারপর হাত ধরাধরি করে ওরা ফিরবে ওদের কুটীরের দিকে।···

দর্প নীরবে তাকায় একবার রত্নার মুখের দিকে,—আর একবার ঐ বকুলতলার পবিত্র বেদীটির দিকে। কতদিনের কত তরুণ-তরুণীর পবিত্র-মিলনের ঐ পুণ্য স্থানটিতে ঐ সাঁওতাল তরুণ-তরুণীর মত দর্পও যদি দাঁড়াতে পারতো রত্নার হাতখানি ধরে। যদি ওদেরই মতন······

: চলো রত্না, ঐ বেদীর ওপর আমরা দুজনে—

মেলার ওধার থেকে হঠাৎ একটা গোলমাল ভেসে আসে। কারা যেন ঘিরে ধরেছে কাউকে। চেঁচামেচি হচ্ছে ভীষণ। মারধোর হওয়াও বিচিত্র নয়।

মনটাকে দর্প ঐ হাঙ্গামার এলাকা থেকে অনায়াসেই এই বকুলতলার বেদীর কাছেই ফিরিয়ে আনতে পারতো, যদি না অদূরের ঐ গোলমালের ভেতর থেকে একটি নারীকণ্ঠের কাতর আর্তনাদ ভেসে আসতো হঠাৎ।

রত্নাকে ঐখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে ছুটে গেল দর্প সেইদিকে।

ভিড় ঠেলে লোকের মাঝখানে ঢুকে দর্প দেখলে একটি লোককে

ধরে ঠেঙ্গাচ্ছে ক'জনে। বাদবাকী লোকেরা তাদের ঘিরে প্রহৃত লোকটির প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করে চলেছে। আর, একটি তরুণী প্রহাররত লোকটির পা-দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলেছে ক্রমাগত।

ব্যাপার কি? না,—ঐ প্রহৃত লোকটি নাকি কন্ঠিবদল করতে যাচ্ছিল ঐ তরুণীটির সঙ্গে বকুলতলার বেদীতে দাঁড়িয়ে। অথচ জানা গেছে, তরুণীটি নিতান্তই অশুচি। এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে মহেশপুরে ঘর ঐ তরুণীটির। মা ছিল ওর গণিকা। মেয়েটি তার মাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল বছর দুই আগে ঐ প্রহৃত লোকটির সঙ্গে। দু'-বছরের অজ্ঞাতবাসের পর আজ এখানে বকুলতলায় কন্ঠিবদল কোরে ওরা ওদের নতুন সংসার পাতবে, এই ছিল ওদের সাধ।—হঠাৎ মহেশপুর গ্রামের এক তীক্ষ্ণদৃষ্টি হিসেবী লোক দেখে ফেলেছেন দু'জনকে।

: এমন কোরে মারছো কেন ওকে?—দর্প না বলে থাকতে পারে না।

: মারবো না?—গর্জ্জে ওঠে মহেশপুরের হিসেবী লোকটি: বলেন কি মশাই? একটা বেবুশ্যের মেয়ে ঐ বকুলতলায় কন্ঠিবদল করে যাবে লুকিয়ে?—ওরা আমাদের বকুলতলা অপবিত্র করেছে।

মেয়েটি এবার হিসেবী লোকটির পা ছেড়ে জড়িয়ে ধরতে যায় দর্পর পা-দুটো: বাবু গো, বাঁচান ওকে। আমার জন্যে মার খেয়ে মরে যাবে যে মানুষটা!

হিসেবী লোকটি এবার একটু যেন নরম হন: বাঁচবার একটি উপায় আছে। পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিয়ে যা। ঐ বকুলতলা শুদ্ধ করতে হবে।

: পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাবো বাবু ?—কেঁদে ওঠে তরুণীটি।

হিসেবী লোকটি ভেংচে ওঠেন : মায়ের রোজগারের অতগুলো গয়না নিয়ে যে ভাগ্‌লি,—তু'বছরে কি সব গেছে বলতে চাস ?

: কিছু নিইনি,—বিশ্বাস করো গো বাবু,—যাবার সময় মায়ের একটা কানাকড়িও সঙ্গে নিইনি আমি। এক বস্ত্রে চলে গিয়েছিলুম। সে-বস্ত্র পরে ভাসিয়ে দিয়েছি নদীর জলে।

কিন্তু সে-কথা কে বিশ্বাস করবে ?

মীমাংসা করে দেয় দর্প। নিজের গলার সরু সোনার চেনটা খুলে দেয় হিসেবী লোকটির হাতে : এইটে নিয়ে ছেড়ে দাও ওদের।

হিসেবী লোকটি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের দাঁত বেরিয়ে পড়ে। এরপর আর ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই ওদের।

ভিড় হাল্কা হতে থাকে। ভিড়ের ভেতর থেকে একজন কর্কশ কণ্ঠে টিপ্‌পনী কেটে যায় : মাগীটার ওপর লোকটার দরদ যে উথ্‌লে উঠছে রে !—বলিহারী ফাঁদ পেতেছ বাবা !

মন্তব্যকারীর লিক্‌লিকে চেহারা,—গাঁট্‌ওলা ক্ষীণ গলা,—মাথায় কোঁকড়ানো কর্কশ কালো চুল।

কে কি বলে গেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই দর্পর। প্রহারজর্জ্জর লোকটি এবং তরুণীটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললে : নদীর-ঘাটে আমার সাদা ময়ূরপংখী আছে। আমার নাম করে তার ভিতর গিয়ে বোসো তোমরা। আমি তোমাদের পৌছে দেব তোমাদের আস্তানায়।

আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে না দাঁড়িয়ে দর্প ফিরে এল রত্নার কাছে।

রত্না তখনও একা দাঁড়িয়ে আছে সেই বকুলতলার ধারে। রত্নার হাত ধরে দর্প বললে : চলো, মেলাটা তাড়াতাড়ি দেখে নেওয়া যাক্।

: কি হয়েছে গো ওখানে ?

: কিছু না ; এমনি—। চলো, যাই।

রত্না বললে : ঐ বেদীর তলায় দুজনে……কি যেন বলতে বলতে তুমি চলে গেলে তখন ?

: কিছু না। ও কিছু না।—কি বলতে যাচ্ছিলুম তখন, ভুলেই গেছি সব।—চলো, মেলাটা ঘুরে নিই এইবেলা।

রত্নাকে নিয়ে বকুলতলা থেকে যেন পালিয়ে যায় দর্প। তারপর মিশে যায় মেলার হট্টগোলের মধ্যে।

মেলা দেখা শেষ কোরে ওরা যখন ফিরে এল আবার সামিয়ানায়, পিয়ারাবাঈ তখনও কীর্ত্তনের আসর থেকে ফেরেননি। বানিয়ে মিথ্যে কৈফিয়ৎ দেবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গঙ্গাপ্রসাদ সরকার মহা খুশী।

দর্প বললে : চলি রত্না।

: এরি মধ্যে ?—পিসিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে না ?

: একটু কাজ আছে রত্না ;—তাই।

দর্প তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে সামিয়ানা ছেড়ে। তারপর সটান্ নদীর ঘাটে।

ময়ূরপংখীতে উঠে নৌকা ছাড়বার হুকুম দেয় দর্প। ভুবনপুরের খাস্‌মহলের তরণী গোঁসাই-মঠের ঘাট ছেড়ে জলে ভাসে আবার।

পাড় থেকে লিক্‌লিকে নেপাল রক্ষিত বাঁকা হাসি হেসে চীৎকার কোরে ওঠে : বেড়ে আছো দাদা !

সে কথায় কান না দিয়ে দর্প তাকায় নৌকার কাম্‌রার ভেতরে। মেয়েটি বাতাস করছিল লোকটিকে। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল মাথায়। দর্পকে দেখে লজ্জায় একটু সরে বসলো।

: তেমন লাগেনি তো ?

: আজ্ঞে না।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে লোকটি হাউ হাউ করে।

লাগেনি যদি, তাহলে এমন করে কাঁদে কেন লোকটা ?

: নাম কি তোমার ?—জিজ্ঞেস করে দর্প।

: আজ্ঞে ছিঁনিবাস।

: তা' শ্রীনিবাস, কাঁদছো কেন এখনো ? কোথায় লাগছে তোমার ?—সস্নেহে শুধায় দর্প।

শ্রীনিবাস হাউ হাউ করে কেঁদে বলে : দু-বছর কত পরিশ্রম করে কত কষ্টে ঘর তুলেছি একখানা নদীর ধারে ,—ওরা সে-ঘরে থাকতে দিলে না আমাদের।

এইটুকু বলেই আচম্‌কা লোকটা কান্নাটাকে সজোরে চেপে রেখে চুপ্ করে যায় একদম।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না দর্প। শুধু বুঝতে পারে, এরপর শ্রীনিবাসকে আর কিছু জিজ্ঞেস করে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

বড় কাম্‌রার পেছনের মখ্‌মল-মোড়া ছোট্ট খুপরিটির মধ্যে ঢুকে গিয়ে দর্প ময়ূরপংখীর খোলা জানালায় চোখ মেলে দিয়ে

চুপচাপ বসে থাকে। ময়ূরপংখী ভুবনপুর ছাড়িয়েও চলতে থাকে ভেসে।

*   *   *

গোঁসাই-মঠের ধারে শ্যামসায়রের পাড় থেকে [illegible] সামিয়ানা উঠলো সন্ধ্যে নাগাদ। ভুবনপুরের বাঈমহলের লাল-বজরা গোঁসাই-মঠের ঘাট ছাড়লো আরো একটু পরে। সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে ;—শ্যামসুন্দরের মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা থেমে গেছে তখন।

এই মেলার দিনটির জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন পিয়ারাবাঈ সারা বছর ধরে। বড় ভাল লাগে এই মেলাটিকে। কতো অচেনা-অজানা মানুষের ভিড়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে যেন অনেকখানি ছড়িয়ে দিতে পারা যায় ;—বাঁধা মনটাকে ছুটি দিতে পারা যায়।

নবদ্বীপের কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তনের আসরে বসে গান শুনছিলেন যখন, পাশে এসে বসেছিলেন একটি বৃদ্ধা। মলিন অর্দ্ধছিন্ন বসন। কম দেখেন চোখে, কম শোনেন কানে। তবু এসেছেন তাঁর হরিনামের ঝোলাটি নিয়ে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে জলের ধারা।

পানের ডিবে খুলে পান খেতে গিয়ে ডিবেটা এগিয়ে দিয়েছিলেন পিয়ারাবাঈ সেই বৃদ্ধার দিকে,—'পান নেবেন মা ?'

পান নিয়ে মহা খুশী বৃদ্ধা। একগাল হেসে ছিন্ন আঁচলের গিঁঠ খুলে পানের বদলে খানিকটা দোক্তাপাতা দিয়েছিলেন পিয়ারাবাঈকে, —'দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে মা ? নাও তবে। রংপুরের পাতা। আমার বড় ছেলে মহিম এনে দিয়েছিল গেল বছর। রংপুরের

কাছারিতে ও' মোটা মাইনের চাকরি করে কিনা। মাস গেলে বারো তেরো টাকা আয়। মাকে দিয়েছিলো তাই এনে। খাও বাছা, মুখ জলে একেবারে ভরে উঠবে দেখো।'

মহীশূরের কিমামের কৌটোটা লুকিয়ে রেকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন পিয়ারাবাঈ সেই বৃদ্ধার দেওয়া দোক্তাপাতা। মুখ জলে ভরে না উঠলেও চোখ ভরে উঠেছিল জলে।……ছেলে আদর করে এনে দিয়েছে তার মাকে রংপুরের দোক্তাপাতা। তার স্বাদ গন্ধের কি তুলনা আছে? ঐ বৃদ্ধার ছিন্ন আঁচলের গিঁঠের মধ্যে বাঁধা আছে তার ছেলের দেওয়া দোক্তাপাতা। ওযে সাতরাজার ধন।…

জলে ভরে উঠেছিল পিয়ারাবাঈ-এর দু-চোখ।

লাল বজ্‌রা এগিয়ে চলে ভুবনপুরের ঘাটের দিকে ফুলেশ্বরীর কালো জলে ঢেউ তুলে। রত্না চুপচাপ বোসে। কথাটি নেই মুখে। চেয়ে আছে অন্ধকারের দিকে।

সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে ওপারের বকুলতলা ওঠে ভেসে। ভেসে ওঠে তরুণ বৈষ্ণব আর কিশোরী বৈষ্ণবীর সলজ্জ আনন্দোজ্জ্বল মুখ দুটি। ভেসে ওঠে তাদের কণ্ঠিবদলের মধুর দৃশ্য।

মনে মনে নিজেকে সেই কিশোরী বৈষ্ণবীটির জায়গায় দাঁড় করায় রত্না।…রত্না দাঁড়িয়ে আছে বকুলতলায়…দর্প এলো এগিয়ে… হেসে বললে,—'এই মুহূর্তে তোমাকেই আমি আমার সারাজীবনের সঙ্গিনী করে নিলাম রত্না,—আর কেউ নেই আমার জীবনে, শুধু তুমি, তুমি।'…

ঠিক এই কথাটাই তো সেদিন বলতে চেয়েছিল দর্প রত্নাকে। বলেছিল, অবিবাহিতই থাকবে সে চিরদিন,—তার জীবনে থাকবে শুধু বাঈমহল,—আর থাকবে শুধু রত্না।

কিন্তু রত্না কে? কী তার পরিচয়?—জীবনসঙ্গিনী? কে স্বীকার করবে তা? দর্প? শুধু তার স্বীকৃতির মূল্য কী? সমাজ তো স্বীকার করবে না।

সমাজ বলবে, রত্না বাঈমহলের পঞ্চমা মালিকান্। বলবে—ভুবনপুরের রাজার সঙ্গে তার সম্পর্কের আয়ু সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত মাত্র।

কিন্তু বিয়ে যদি সত্যিই না করে দর্প, তাহলে রাত দশটার পর দর্প তার পাশ থেকে চলে গেলেও রত্না তো একথা স্থির জানতে পারবে যে,—খাস্‌মহলে আর কোন মেয়ে তার দর্পকে কেড়ে নেবার জন্যে বসে নেই! রাত দশটার পর দর্প নাই বা রইল পাশে,—কিন্তু একথা তো রত্না স্থির জানবে যে সে একমাত্র তারই, আর কারুর নয়।

কিন্তু এ-জীবন কতোদিন ভাল লাগবে দর্পর? শ্রান্তি আসবে না কি তার? নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে দর্পর ভবিষ্যৎ জীবনটাকে এমন কোরে বর্ণহীন করে তোলা কি উচিত হবে রত্নার?

কিন্তু, বাঈমহলের বাঈজীর বাঁধা-ছকের জীবন যাপন করা ছাড়া আর কোনরকমে জীবনটাকে সার্থক করে তোলার কোন অধিকারই যদি দিলেন না ভগবান, তাহলে কেন রত্না বোকার মতো বালিকা বয়েস থেকে দর্পর প্রতি তার ভালবাসাটাকে হৃদয়ে এমন কোরে লালন করে এল? এ বোকামী কেন করলো রত্না? যা হবার নয়, তারই স্বপ্নে কেন বিভোর হয়ে কাটালো এত গুলো বছর?

ভাবনাকে থামাতে হল এইখানেই। বজ্‌রা ভুবনপুরের ঘাটে এসে লেগেছে। পিয়ারাবাঈ ডাক দিয়েছেন। এখনি নামতে হবে রত্নাকে।

*   *   *

ওদিকে কালীবাড়ীর বাঁক পেরিয়ে ফুলেশ্বরী যেখানে দেওয়ান পুরের জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে, সেইখানে দর্পর ময়ূরপংখী এসে পৌছলো যখন, তখন সূর্য্য পাটে বসেছেন। শ্রীনিবাস বললে : এইখানে নৌকো থামাও গো নেয়ে।

দর্প আশ্চর্য্য হয়ে বলে : এখানে?—ক'ঘর কাঠুরে ছাড়া আর তো মানুষজন থাকে না এধারে। এখানে নামবে কোথায় তোমরা?

হাসে শ্রীনিবাস। ম্লান করুণ হাসি। মেয়েটি নতমুখে দাঁড়িয়ে পাশটিতে। লক্ষ্মী ওর নাম।

ভুবনপুরের ময়ূরপংখী এসে লাগে দেওয়ানপুরের জঙ্গলের আঘাটায়। শ্রীনিবাস ও লক্ষ্মী পায়ের ধুলো নেয় দর্পর। বলে : যাই কত্তা তবে?

কি মনে হয় দর্পর। বলে : চলো, দেখে আসি তোমাদের ঘর।

: ঘর?—অদ্ভুত করুণ হাসি ভেসে ওঠে শ্রীনিবাসের মুখে। বলে : আসুন।

কথাটা সাদর আমন্ত্রণের মতো শোনায় না মোটেই। তবু দর্প নৌকা থেকে নেমে চলে ওদের সঙ্গে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু একটি পায়ে চলা পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়েছে। বোধহয় ঐ লক্ষ্মী আর শ্রীনিবাসের পায়ে পায়েই গড়ে উঠেছে পথটা এই দু'বছরে। সেই পথ ধরে এগোতে এগোতে

এক জায়গায় ওরা থামে। সামনে বুনো-গাছের শক্ত বেড়া দেওয়া বেশ খানিকটা জায়গা। শাক-সব্জীর ছোটখাটো ক্ষেত। লাউমাচায় অনেক লাউ ধরেছে। বেগুনগাছে পুরুষ্টু বেগুন। ছোটখাটো সেই ক্ষেতটির শেষে চমৎকার একটি কুটির। তক্‌তকে তার আঙিনা,—ঝক্‌ঝকে গা। দেয়ালে নিপুণ হাতের আলপনা। কোথা থেকে একটি মাধবীলতার গাছ এনে বসানো হয়েছে কুটিরের দাওয়ার পাশটিতে। আঙিনার মাঝখানে সুন্দর একটি তুলসীমঞ্চ।

শ্রীনিবাস বেড়ার দরজাটা খুলে দর্পকে ভেতরে যাবার আহ্বান জানাবার আগেই লক্ষ্মী সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কুটিরের আঙিনায় এসে আছড়ে পড়লো একেবারে। তারপর সে কী তার কান্না!

বেশ তো ছিল মেয়েটা। নৌকোয় কেমন বসে ছিল চুপটি করে। সারাপথটা কেমন শান্ত হয়ে এসেছে পিছনে পিছনে। হঠাৎ কেন তার এমন কান্না?

দর্প শুধোয়: ও অমন কাঁদে কেন শ্রীনিবাস?

: দু-বছর ধরে কত কষ্ট করে কত আশা নিয়ে গড়েছি আমরা এই ঘর। ওরা আমাদের থাকতে দিলো না এ-ঘরে কত্তা,—ওরা আমাদের এ-ঘর কেড়ে নিলে!—

বলতে বলতে দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে শ্রীনিবাসের।

ময়ূরপংখীতেও এই ধরণের কি একটা কথা বলতে বলতে তখন থেমে গিয়েছিল শ্রীনিবাস,—বেশ মনে পড়ে দর্পর। কিন্তু সেবারের মত এবারেও কথাটার মানে বুঝতে পারে না ঠিক। শুধোয়: কে কেড়ে নিল তোমাদের এ-ঘর?

: ওই ওরা। যারা দিলে না আমাদের কণ্ঠিবদল করতে বকুলতলার বেদীতে দাঁড়িয়ে।

কথাটা তবু হেঁয়ালী হয়ে থাকে দর্পর কাছে। ডুকরে ডুকরে তখনও কেঁদে চলেছে লক্ষ্মী আঙিনার তুলসীমঞ্চের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে শ্রীনিবাসের। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ক্রমে। জোনাকীরা ফুটে উঠতে সুরু করেছে গাছের পাতায় পাতায়।

কান্না থামিয়ে শ্রীনিবাস বলে: ফিরবেন না হুজুর? আঁধার হয়ে গেল।

: যদি থেকেই যাই তোমাদের কুঁড়েতে আজকের রাতটা?—দেবে না থাকতে?

: সে তো পরম সোভাগ্য আমার।—ঘাড় হেঁট করে বলে শ্রীনিবাস। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে: আসুন আমার সঙ্গে।

: লক্ষ্মী?—প্রশ্ন করে দর্প।

: ও থাক্। আর একটু কাঁদুক ও' ঐখানে শুয়ে। হাল্কা করে নিক বুকটা।

প্রতিবাদ করবার কোন জোরই যেন পায় না দর্প। অনুসরণ করে শ্রীনিবাসকে।

বাগানের দরজা খুলে বেরিয়ে ডান ধারে বেঁকে একটা বাঁশ ঝাড়ের তলা দিয়ে এগিয়ে শ্রীনিবাস দাঁড়ায় একটি জীর্ণ ছোট্ট কুঁড়ের সামনে। ব্যস্ত হাতে কুঁড়ের দোর খুলে একটি ছোট্ট শীতলপাটি বিছিয়ে দেয় দাওয়ায়। ঘরের ভেতর থেকে একটি পিদিম এনে জেলে দেয় সসম্ভ্রমে। বলে: বসুন কত্তা। তারপর আরেকটি প্রদীপ হাতে নিয়ে বলে: আসছি এখনি। ঐ তুলসীতলায় আলোটা দিয়ে

আসি। লক্ষ্মী অন্ধকারে একা আছে কি না। দোষ নেবেন না হুজুর।

চলে যায় শ্রীনিবাস ব্যস্তভাবে। ভাঙ্গা কুঁড়ের মাটির দাওয়ায় মিট্‌মিটে পিদিমের আলোয় চুপ্‌চাপ বসে দর্প ভাবে আকাশ-পাতাল। ওরা কি করে কেড়ে নিলে এদের ঘর ?—অমন চমৎকার ছবির মতন কুটির থাকতে শ্রীনিবাস এই ভাঙ্গা কুঁড়েতে থাকে কেন ?

ফিরে আসে শ্রীনিবাস।

: দিয়ে এলে আলো ?

: এলাম কত্তা।

: লক্ষ্মী এখনো তেমনি পড়ে আছে ? তেমনি কাঁদছে এখনো ?

: না। উঠেছে।

: নিয়ে এলে না তাকে ?

: সে তার কুঁড়েয় গেছে।

: তার কুঁড়ে ?—এটা তবে কার ?

: শুধু আমার।—ওর কুঁড়ে ঐ ওধারে কাঁঠাল গাছের পেছনে।

: তুমি একা থাকো ?

: লক্ষ্মীও একা থাকে কত্তা।

: কেন ?

জবাব দেয় না শ্রীনিবাস। ম্লানমুখে তাকিয়ে থাকে শুধু অন্ধকারের দিকে।

: ঐ যে বাগান,—ঐ যে চমৎকার কুটীর,—কার তবে ওটা ?

: আমাদের দুজনের।—দু'বছর ধরে দুজনে অনেক কষ্ট করে অনেক পরিশ্রম আর অনেক স্বপ্ন দিয়ে গড়েছি।—বড় আশা ছিল, কণ্ঠিবদল কোরে একদিন দুজনে একসঙ্গে থাকবো ওখানে,—সংসার গড়বো,—……বলতে বলতে থেমে যায় মাঝপথে শ্রীনিবাস। বাকীটা বোধহয় মনে মনে দেখতে থাকে স্বপ্নের ছবির মতো। তারপর একসময় মাথাটা নাড়তে নাড়তে বলে ওঠে : হল না,—হল না,—ওরা থাকতে দিলে না আমাদের ও-ঘরে। সংসার করতে দিলে না কিছুতেই।

: কেন ?—ও-ঘরে থাকতে বাধা কিসের তোমাদের ?

: বাধা ?—দর্পর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রীনিবাস বলে : আমরা যে কেউ কারুর হই না কিছু এখনো।—আমাদের যে কণ্ঠিবদল হলো না।

কি বিচিত্র মানুষের মন!—গণিকার মেয়েকে ভালবাসতে বাধেনি তার। সে-ভালবাসার জন্য জঙ্গলের মধ্যে এই অজ্ঞাতবাসকে বরণ করে নিতেও এতটুকু দুঃখ নেই শ্রীনিবাসের।—প্রেমের জোরে সংস্কারকে সে তুচ্ছ করেছে, দুঃখকে হেসে দিয়েছে উড়িয়ে। কিন্তু এই শেষ জায়গাটিতে এসে সংসার পাতবার সময়টিতে তার মন কিসের বাধায় থমকে দাঁড়ায় ?

দর্প বলে : নাই বা হল কণ্ঠিবদল। তুমি যে লক্ষ্মীর স্বামী এটা কি এই দু'বছরেও প্রমাণিত হয়নি ?

জিভ্ কাটে শ্রীনিবাস।—উচ্চারণ করতে নেই মুখে ও-কথা! বকুলতলার বেদীতে যাদের কণ্ঠিবদল হল না,—তাদের যে স্বামী-স্ত্রী হবার উপায় নেই একতিল। এ-অঞ্চলের সকলেই যে ঐ বকুলতলার

বেদীতে গিয়ে কন্ঠিবদল কোরে তবে সংসার পেতেছে। তার অন্যথা করে কি কোরে শ্রীনিবাস ?

লোকালয় থেকে কত দূরে নির্জ্জন জঙ্গলে বাসা বেঁধেছে শ্রীনিবাস আর লক্ষ্মী। সমাজ ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের বাস। কেউ দেখবার নেই,—কেউ বলবার নেই কিছু। তবু এ বাঁধা কোথা থেকে আসে ?

: কি করবে তাহলে ঠিক করেছ ?—দর্প প্রশ্ন করে ধীর কণ্ঠে।

: কি আর!—দু'বছর যেমন করে কেটেছে,—তেমনি করেই কেটে যাবে আমাদের বাকি জীবনটা।

এখানে, এই ছোট্ট কুটিরটিতে থাকবে শ্রীনিবাস,—ওখানে ঐ কাঁঠাল গাছের পিছনের কুটিরে থাকবে লক্ষ্মী ;—মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ওদের দুজনের বড় সাধ নিয়ে বড় সাধনায় গড়া সুন্দর ঐ কুটিরটি ওদের এ-জীবনের বিফল স্বপ্নের প্রতীক হয়ে। খোলা হবে না কোনদিন সে-কুটিরের দ্বার,—মাধবীলতার ফুল তুলে গাঁথা হবে না মালা, পরানো হবে না খোঁপায়। শুধু তার ফুলের সুবাস ওদের পবিত্র প্রেমের মতোই ঘিরে থাকবে ওদের দুটি মনকে।

তারপর ?

পরজন্মে বিশ্বাসী ওরা। পরজন্মে নিশ্চয়ই ওদের মিলন হবে।

ফুলেশ্বরীর তীরে কাঠ জ্বেলে রাতের পাক করতে বসেছিল মাঝিরা। হঠাৎ অবাক্ হয়ে দেখলে দ্রুত পদে ফিরে আসছেন কুমার দর্পনারায়ণ।

ময়ূরপংখীতে উঠে দর্প গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলে : নৌকা ছাড়ো।

কুমারবাহাদুরের চোখমুখের চেহারা দেখে মাঝি-মাল্লাদের কারুর সাহস হয় না একথা উচ্চারণ করতে যে,—এত রাত্রে নৌকো ছাড়ায় বিপদ আছে।

রাতের অন্ধকারে একা ভেসে চলে ময়ূরপংখী। রাতের অন্ধকারে একা ভেসে চলে দর্পনারায়ণের মন।...

...রত্না? রত্না কি ঘুমিয়ে পড়েছে? না কি এত রাতেও চেয়ে আছে খাস্‌মহলের বাতায়নের দিকে?

দিন দুয়েক পর। সন্ধ্যে তখনো হয়নি। রত্না তখন দাসীর কাছে চুল বাঁধছিল বাঈমহলের দক্ষিণের ঘরে বসে। পাঁচ বিনুনীর বিনোদ-খোঁপা। খবর এল,—ছাদের ওপরের গোম্বুজ-ঘরে ছোট-রায় অপেক্ষা করছেন।

ছোট রায়? দর্প?—গোম্বুজ-ঘরে?

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে রত্না।

বাঈমহলের ছাদের ওপরকার গোম্বুজঘরের বাইরের দেয়ালে, যেখানে অনেক বৃষ্টির জল গড়িয়ে গড়িয়ে শ্যাওলার সবুজ রং ধরিয়ে দিয়েছে সাদা চুনকামের ওপর, সেখানে এখনো হয়তো খুঁজলে দেখতে পাওয়া যাবে বালক-দর্পর অনেক দিন আগেকার আঁকাবাঁকা হাতের অক্ষর,—'আমি ভাব করিয়াছি।'

ছাদের গোম্বুজঘরের চারিদিকে পায়রার পালখ মাড়িয়ে পায়চারী করতে করতে যুবক দর্প অনেক দিন আগেকার সেই আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলোকেই খুঁজছিল বোধ হয় মনে মনে।

গোম্বুজ-ঘরটা ঠিক সেই আগেকার মতোই আছে।—কতকাল পর বাঈমহলের ছাদে উঠেছে দর্প।—তেমনি শ্যাওলার গন্ধ, তেমনি পড়ন্ত বিকেলের লম্বা ছায়া, তেমনি পায়রার বকবকম্‌, তেমনি হঠাৎ দু' একটা পায়রার এখান থেকে ওখানে উড়ে যাওয়া।—সবই তেমনি আছে, শুধু সেই মনটা নেই। ছোটবেলার অনেক ভাব আর অনেক আড়ির স্মৃতি নিয়ে গোম্বুজঘরটা ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে বাঈমহলের ছাদে,—শুধু ছোটবেলার সেই দর্প আর সেই রত্না আর নেই; তারা অনেক বড় হয়ে গিয়ে অনেক বদলে গেছে।

ছোটবেলার সেই দর্প যদি থাক্‌তো, তাহলে সে কি এমন কোরে পায়চারী করতো ছাদে ? এতক্ষণে সে-দর্প গোম্বুজঘরের দো-ছোত্‌রির ওপর যেখানে পুরোনো বাসন গাদা করা আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়তো ঠিক্‌। রত্না এসে অনেক খুঁজে অনেক ডেকেও দর্পকে না পেয়ে খানিকটা ভয়ে আর খানিকটা অভিমানে কেঁদে ফেলতো যখন, তখন দর্প ধুপ্‌ কোরে রত্নার সামনে নেমে পড়ে হিহি কোরে হেসে বলতো : নুন কই ? নুন ?

রত্না বাঁ হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে ডান হাতের মুঠো খুললেই দেখা যেত, নুন আনতে সে মোটেই ভোলেনি।

তারপর ?

দুজনে গলাগলি হয়ে বসে নুন দিয়ে কাঁচা পেয়ারা চিবোতো এতক্ষণে খান তিনেক।

ঐ ছেলেবেলাটাই যদি থাকতো দর্প আর রত্নার সমস্ত জীবনটা জুড়ে। বড় হত না দর্প, বড় হত না রত্না,—সেই ছোট্টটি চিরকাল, সেই সহজ মেলামেশা জীবন ভোর !

কিন্তু দক্ষিণের ঘর থেকে গোম্বুজঘরে আসতে রত্নার আজ এত দেরী হচ্ছে কেন ? পায়চারী করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে দর্প,— তবু দেখা নেই !

এক পা এক পা করে কখন্‌ গোম্বুজঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে দর্প। গোম্বুজঘরটার মধ্যে ঢুকলেই যদি এক লহমায় শৈশবের ফেলে-আসা খোলস্‌টার মধ্যে সুট্‌ করে ঢুকে পড়া যেত !

হাঁউমাউ খাঁউ।

শব্দটা শুনে চমকে পিছন ফিরে দর্প ছাখে,—রম্ভা। অসম্পূর্ণ কেশসজ্জা, চুলের তেলে চক্‌চকে হয়ে আছে মুখটি, জামদানী শাড়ীর আঁচলটা আলগা করে ফেলা রয়েছে কাঁধে, চোখে শুর্মা নেই, নখে মেহেদীপাতার রং নেই ; হুবহু বাংলাদেশের গাঁয়ের মেয়েটি।

: ভয় পেয়েছিলে তো ?—খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বলে রম্ভা : ভেবেছিলে তো, শ্যাওড়া গাছের পেত্নী ?

অন্য সময় হলে দর্প নিশ্চয়ই বলতো,—'ভেবেছিলুম কেন, এখনো দেখছি তো তাই চোখের সামনে।'—আজ কিন্তু চুপ করেই থাকে।

: অঙ্গে দেখছি শিকারের পোশাক।—তা' এতকাল পরে হঠাৎ গোম্বুজঘরে এসে উঠলে কেন ? বন্দুক দিয়ে পেয়ারা পেড়ে এনেছ বুঝি ?

তবু কথা কয় না দর্প।

: এই ছাখো, নুন এনেছি সেই আগেকার মতন।

রম্ভা হাতের মুঠো খোলে। নরম রাঙা হাতের তালু। সত্যি এনেছে নুন। হেসে বলে : কাঁচা পেয়ারা কই গো ?

: সব সময় ঠাট্টা-তামাসা ভাল লাগে না রম্ভা।

দর্পর কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস।

: মেজাজ এত তিরিক্ষে কেন ? শিকারে গিয়ে একটাও পাখী মারতে পারোনি বুঝি আজ ?

: না।

দর্পর কণ্ঠ গম্ভীর।

রম্ভা কিন্তু যেন গোম্বুজঘরের ছাদে এসে আগেকার মতোই ছেলেমানুষটি হয়ে গেছে। হাত মুখ নেড়ে হেসে বলে : মারতে

পারবে কি কোরে। পাখীর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে মনে হল, উঁহু ও তো পাখী নয়, ও যে বাঈমহলের রতন। অমনি তোমার হাত গেল কেঁপে, টিপ্ গেল ফস্কে......

: ঢং কোরো না রতন। মেজাজ ঠিক নেই।

: কেন গো?

এবার সহানুভূতির সুর রত্নার কণ্ঠে।

: বন্দুক নিয়ে দক্ষিণের জলার কাছে সবে পৌঁছেছি, হরিসিং দরোয়ান গিয়ে হাজির। বললে, বাবা নাকি ডেকে পাঠিয়েছেন।

: তারপর?

: রেকাব খুলে ঘোড়াটাকে দিয়েছিলুম ছেড়ে,—আবার জীন্ চাপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ী ফিরি তক্ষুনি।

: কেন ডেকেছিলেন?

: বাড়ী ফিরে দেখি, একজন ভদ্রলোক গল্প করছেন বাবার সঙ্গে নীচের হলঘরে। আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন,—'প্রণাম করো খোকা'।—কে জান তিনি?

: কে?

: শিবগঞ্জের সেই পরমাসুন্দরী মেয়ের বাপ স্বয়ং। এসেছেন, পাত্রটিকে অর্থাৎ আমাকে স্বচক্ষে দেখতে।—দর্পর কণ্ঠে উত্তেজনার স্পষ্ট সুর।

এতক্ষণে রত্না বেশ বুঝতে পারে দর্পর গম্বুজ ঘরে আসার অর্থ। বেশ বুঝতে পারে, কী দর্প বলতে এসেছে;—কী সে চাইতে এসেছে ছুটে। তাই, তাদের ছোটবেলার লুকোচুরি খেলার গোম্বুজ-ঘরে দাঁড়িয়ে রত্নাকে আজ নিজের মনের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলা সুরু করতে হয়।

রত্না হেসে বলে : ভাবী শ্বশুরের চেহারা কেমন ?

প্রশ্নটা শুনে অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে দর্প রত্নার দিকে। কথাটা কি সত্যিই রত্নার মুখ থেকে বেরুলো ? তারপর স্থিরকণ্ঠে বলে : কেন ?

: সেটা শুনতে পেলে শিবগঞ্জের সেই পরমাসুন্দরীর রূপের খানিকটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করতাম।—রত্না আবার হাসে। হেসে বলে : যাক্, সানাই বাজছে তাহলে এবার খাস্‌মহলে ! আমায় কি দেবে বলো ?

: কি বক্‌ছো তুমি রতন ?

দর্প এ কোন্ রত্নাকে দেখছে আজ সামনে ?

রত্না হাসে : বা রে, বকশিস্ পাবো না ? ভুবনপুরের ছোট হুজুরের বিয়ে !

: আচ্ছা, চিরকালই কি তুমি সব জিনিষ এমনি কোরে হেসে হাল্কা কোরে দেবে ?—দর্প এবার হাত ধরে রত্নার। গলা তার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আর হাসতে পারে না রত্না। আসন্ন সন্ধ্যার মতোই ম্লান হয়ে ওঠে তার গলা। ধীর স্বরে মাথা নিচু কোরে বলে : আশীর্ব্বাদ করো, তাই যেন পারি। যেন আমার কলঙ্কে তোমাকে কলঙ্কিত না করি কোনদিন !

কলঙ্ক !—

গম্বুজ ঘরে দাঁড়িয়ে দর্প দূরের দিকে আঙুল দেখায়,—যেখানে ভুবনপুরের ঘন্টাফটককেও পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে গাছ-গাছালিরা, তারপর নিজেদের আলাদা চেহারাকে হারিয়ে সবুজে-

ধূসরে একাকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দিকচক্রবালে। বলে: পৃথিবীটার ওখানেও শেষ নয় রত্না, ওর পরে আরো আছে;—আরো, আরো। সেখানে নতুন পরিচয়ে নতুন কোরে ঘর বাঁধার কোন অসুবিধেই তো নেই। সেখানের সমাজে ঠাই পাবো আমরা।

বিহ্বলভাবে রত্না তাকায় দর্পর মুখের দিকে। দর্প আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে চলে: তোমাতে আমাতে যদি পালিয়ে চলে যাই ঐ অনেক দূরের সমাজে।—যাবে রত্না?

রত্না তাকায় চোখ তুলে। কল্পনায় ছাখে দর্প'র সাদা ঘোড়াটা ছুটে চলেছে ভুবনপুরের ঘণ্টাফটক পেরিয়ে উধাও হয়ে। তার পিঠে সওয়ার হয়ে লাগাম ধরেছে দর্প, আর তারই পিছনে বোসে আঁকড়ে ধোরে আছে তাকে রত্না। পৃথ্বিরাজ যেন হরণ কোরে নিয়ে যাচ্ছে সংযুক্তাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ,—যাবে রত্না।—ওগো দর্প, রত্না যাবে তোমার সঙ্গে পালিয়ে।

বাঈমহলের জানলায় দাঁড়িয়ে খাস্‌মহলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে আর পারে না গো রত্না, পারে না। সারেঙ্গী নয়, পাঁয়জোড় নয়, জড়োয়া ঝাপ্‌টায় সিঁথি ঢাকা দেওয়া নয়;—ছোট্ট একটি সংসার, ঘর-গেরস্থালী, সিঁথিতে রাঙা সিঁদুরের রেখাটি! ওগো দর্প, তাই করো। ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাও রত্নাকে এই বাঈমহল থেকে ঐ দূরে কোথাও; তারপর ছোট্ট একটি সংসারের নানান্ খুঁটিনাটির মধ্যে তাকে নামিয়ে দিয়ে বোলো,—সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত দশটা নয় গো, তোমার পাশে আমি সারাদিন আছি, সারাজীবন আছি।

রত্না বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে তার স্বপ্নরাজ্যের দিকে। কথা সরে না মুখে। দুটি হাত দিয়ে শুধু আঁকড়ে ধরে দর্পর হাত দুটি।

আবার শুধোয় দর্প : যাবে রতন ? যাবে তুমি ?

'হ্যাঁ' কথাটি উচ্চারণ করবার আগে আর একবার তাকায় রত্না সামনের দিকে। হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়ে নিচের বাগানে।

প্রৌঢ় অনন্তনারায়ণ লাঠিতে ভর দিয়ে পায়চারি করছেন ধীরে ধীরে।—দুর্ব্বল, রোগজীর্ণ, নিঃসঙ্গ।

সমস্ত পৃথিবীটা যেন এক লহমায় তার ছড়ানো জালটাকে গুটিয়ে নিয়ে ছোট হয়ে আসে ঐ বাগানটুকুর মধ্যে। না, না, উপায় নেই। উপায় নেই রত্নার,—কোন উপায় নেই।

আশ্চর্য্য স্থিরকণ্ঠে রত্না বলে : তোমার বাবার কথা ভেবে দেখেছ ?

বোবা হয়ে যায় দর্প। কথা সরে না মুখে।

রত্না বলে : একমাত্র ছেলে তুমি তাঁর। বৌ-এর মুখ দেখবেন, নাতির মুখ দেখবেন, এ বয়সে এই তো ওঁদের একমাত্র সাধ।

আর কথা বলে না কেউ। সন্ধ্যা নেমে আসে নীরবে। চারিদিকের শান্ত নীরবতা দুজনকে ঘিরে থম্‌থম্ করতে থাকে মৌন বেদনায়। সেই অখণ্ড নীরবতার মাঝে সন্ধ্যার নিঃশব্দ আকাশে দল-ছাড়া পথহারা পাখীর ডানার শব্দের মতো অসহায় শোনায় দর্পর কণ্ঠ : কিন্তু রত্না, তোমার আমার—

: আমাদের এই পরিচয়ই ভাল দর্প। ঘণ্টাকটকে সন্ধ্যা সাতটা বাজবার পরেই না হয় দেখা হবে আমাদের। আমার সেই যথেষ্ট।

: কিন্তু দু-মহলের টানা-পোড়েন, ও যে আমি কিছুতেই পারবো না সইতে রত্না।

রত্না তার বড় বড় চোখ তুলে তাকায় দর্পর ম্লান মুখের দিকে : নাই যদি পারো —শুধু একটা মহলই না হয় থাকবে তোমার জীবনে।

: তাই হোক্ রত্না। আমার জীবনে থাকুক শুধু···

: খাস্‌মহল!

রত্না তাড়াতাড়ি জুড়ে দেয় কথাটা।

: রত্না!—চম্‌কে চীৎকার করে ওঠে দর্প।

: বাদ যদি একান্তই দিতে হয়, তাহলে বাঈমহলকে বাদ দেওয়াই উচিত দর্প।—আশ্চর্য্য শান্ত স্বরে এই কটি কথা বলে রত্না ফিরে যায় ধীর পদক্ষেপে।

দর্প পিছু ডাকে। কণ্ঠে তার কান্নার আভাস : রত্না, রত্না শোনো।

জয়পুরের মেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় : কি বলবে বলো?

রুদ্ধগৃহের প্রদীপ শিখাটির মতোই স্থির অচঞ্চল তার কণ্ঠস্বর। হৃদয়াবেগের বাতাস তাকে একটুও কাঁপাতে পারেনি!

জয়পুরের মেয়ে রত্না,—মরুভূমির মেয়ে;—মনে কি তাই ওর একবিন্দু জল নেই!

আর কোন কথা বলা হয় না দর্পর। দ্রুত পদক্ষেপে নেমে আসে গোম্বুজঘর থেকে। ছাদের ওপর একা দাঁড়িয়ে থাকে রত্না।

আকাশের রং লাল হয়। গোম্বুজঘরের ছায়া দীর্ঘতর হতে হতে শেষকালে কখন্ সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায়।

আকাশে এসে উঁকি দেয় তারার দল একটি একটি কোরে। ফিরে আসে পায়রার দল গোম্বুজঘরের খোপে খোপে। রাতচরা বাহুড়ের দল উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে। ঝিঁঝির ডাক স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অন্ধকারের বুকে জোনাকীরা সবুজ ওড়নার চুমকির মতো জলজল করে। ছাদের ওপর তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে রম্ভা একা।

: রম্ভা।

পিয়ারাবাঈ খুঁজতে খুঁজতে এসে উঠেছেন ছাদের ওপর।

: ওঃ পিসিমা? সহজ হবার চেষ্টা করে রম্ভা : কি বলছো?

: এখানে এমন সময় একলাটি দাঁড়িয়ে? খাঁ সাহেব বসে আছেন ঘরে। গান শিখলে না মা?

: শরীরটা ভাল নেই পিসিমা,—কেমন মাথা টিপ টিপ করছে।

: ভাল কোরে ফিরে দাঁড়া তো আমার দিকে।—পিয়ারাবাঈ-এর কণ্ঠে স্নেহের সঙ্গে আদেশের সুরটাও মিশিয়ে থাকে।

ফিরে দাঁড়ায় রম্ভা।—ফিরে দাঁড়ায় জয়পুরের মেয়ে। জলের ধারা নেমেছে ছু-চোখ বেয়ে। মরুভূমির মেয়ের চোখে জল!

নিবিড় কোরে জড়িয়ে ধরেন পিয়ারাবাঈ তাঁর আদরের ভাইঝিটিকে। রম্ভা মুখ লুকোয় তাঁর বুকে। সব জানা হয়ে গেছে পিয়ারাবাঈ-এর। মায়েদের কাছে কি লুকোবার জো আছে মেয়েদের মনের কোন কথা?

সেই অন্ধকারে পিয়ারাবাঈ-এর কণ্ঠ সারেঙ্গীর করুণ সুরের মতো কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে : এ তুই কী করেছিস্ বোকা মেয়ে?—এ কি তোর আমার সাজে মা?—আমাদের কি অমন কোরে ভালবাসতে আছে, না ভালবাসার অধিকারই আছে

আমাদের ?—ওরে শোন্,—দর্পর সামনে এমন কোরে চোখের জল ফেলিসনি যেন কোনদিন। আনমনা উদাসী হয়ে দাঁড়াসনি যেন কখনো। যে পাগল ছেলে,—বলেই বসবে হয়তো,—'বিয়েই করবো না'। তাহলে সে যে বড় দুঃখের কথা হবে ;—ভুবনপুরের বড় কলঙ্কের কথা !

পিসির বুকে মুখ লুকিয়ে রত্না বলে : বলেছিল পিসিমা।

: কী ?

: বিয়ে করবে না। বলেছিল, আমাকে নিয়ে সে চলে যাবে অনেক দূরে—কুটির বাঁধবে,—ছোট্ট কুটির।

শিউরে ওঠেন পিয়ারাবাঈ : রত্না, ওরে তুই কি বললি ?

রত্না বললে : জানিয়ে দিয়েছি, তাও কি হয় ? আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘণ্টাফটকে সন্ধ্যে সাতটার ঘণ্টা বাজবার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টারই,—তার বেশি নয়।

আবেগে আরো নিবিড় কোরে জড়িয়ে ধরলেন পিয়ারাবাঈ রত্নাকে। আনন্দাশ্রু নেমে এসেছে তাঁর চোখে। বুক ভরে উঠেছে পরম শান্তিতে, পরম গর্ব্বে। আর কেউ না জানুক, ওপরের ঐ বিধাতাপুরুষ তো জানলেন, কতবড় ত্যাগ দিয়ে কতবড় আঘাত থেকে বাঁচিয়েছে রত্না ভুবনপুরের প্রৌঢ় জমিদারকে !

কেঁপে ওঠে পিয়ারাবাঈ-এর কণ্ঠ : ওরে, জীবনে যদি বাঈজীর ঘরে জন্মানো ছাড়া জ্ঞানতঃ আর কোন পাপ কোন অধর্ম্ম না কোরে থাকি, তাহলে আমি বলছি, তুই সুখী হবি, নিশ্চয়ই সুখী হবি।

* * *

সুখী ?—সুখী হবে রত্না ?

চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে গাজনতলার মাঠে সন্ন্যাসীরা কাঁটাগাছে

ঝাঁপ খায়, হেঁটে চলে জ্বলন্ত আগুনের ওপর দিয়ে, কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে দেয় নিজের হাত, চড়কগাছে ঝোলে। তাদের কথা মনে পড়ে যায় রত্নার।

লোকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে ছাখে তাদের দিকে। বাহবা দেয়। শ্রদ্ধা জানায়। প্রণাম করে।

শরীরকে অতখানি কষ্ট দিয়ে ঐ শ্রদ্ধা এবং প্রণামটুকুই কি শুধু পাওনা হয় ওদের? না কি সত্যিই আরো বাড়তি কিছু লাভ হয়? —কি সেটা? তাকেই কি বলে সুখ? পিসিমা কি সেই সুখে সুখী হবার আশীর্ব্বাদ জানালেন সেদিন রত্নাকে?

কিন্তু সে-সুখ কী? কী তার রূপ? কী তার বর্ণ? কী তার স্বাদ?

নিজেকে বঞ্চিত করার মধ্যে একটা গর্ব্ব আছে,—মহত্বের গর্ব্ব। সেই গর্ব্বতেই কি সুখ? কিন্তু সুখ যদি, তাহলে রত্নার প্রাণটা ভিতরে ভিতরে কেবলই কাঁদছে কেন? আবার, কাঁদছেই যদি, তাহলে কেনই বা দর্পর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারল না রত্না সেদিন সন্ধ্যায়?

দর্পকে না পাওয়ার দুঃখে কাঁদছে যে মেয়েটি, তার নামও রত্না; আবার, দর্পকে প্রত্যাখান করলো যে মেয়েটি সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে,—তার নামও রত্না। এই দুই রত্নার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঈমহলের মেয়েটি নিজেকে কিছুতেই খুঁজে পায় না।

খুঁজে পায় না দর্পও।—বাঈমহলের ফোয়ারার ধারে আর খুঁজে পাওয়া যায় না রত্নাকে। দেখতে পাওয়া যায় না তাকে বাঈমহলের ঝুল্-বারান্দায়। ফিরে যায় দর্প।

খাস্‌মহলে দর্পর বিয়ের কথাবার্ত্তা যত পাকা হতে থাকে, রত্না তত বেশি করেই যেন লুকিয়ে রাখে নিজেকে। দর্পর পায়ের নাগ্‌রার শব্দ পেলেই বাঈমহলের মেয়ে জোর কোরে সেই-রত্নার হাত আঁকড়ে ধোরে পিয়ারাবাঈ-এর ঘরে গিয়ে লুকোয়, যে-রত্না অনন্ত-নারায়ণের কথা ভেবে স্থিরকণ্ঠে প্রত্যাখান করতে পারে দর্পকে।

তারপর, দর্পর নাগ্‌রার শব্দ যখন বাঈমহলের বাইরে বেরিয়ে যায়, তখন নিজের ঘরে ঢুকে ফুলে ফুলে কেঁদে ওঠে বালিসে মুখ গুঁজে।

* * *

যথাসময়ে খাস্‌মহল থেকে সংবাদ আসে,—শিবগঞ্জ থেকে কন্যাপক্ষ এসে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন দর্পকে কমলহীরের আংটি দিয়ে।

সদররংয়ে তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রৌঢ় অনন্তনারায়ণ। আজকাল প্রায়ই এমন হয়। বড় যেন ক্লান্ত মনে হয় ওঁকে। কথাবার্তা কমে এসেছে। চলাফেরা আরো কম। সারাদিনই কেমন একা একা চুপ্‌চাপ্ থাকেন। সন্ধ্যের পর অভ্যাস মতো বাঈমহলে যান অবশ্য রোজই।—সারেঙ্গী বাজে না, তব্‌লা-ঝুমুরের শব্দ ওঠে না,—নাচঘরে জ্বলে শুধু একটিমাত্র তেলের সেজবাতি। তারই অস্পষ্ট আলোকে ঘরে থাকেন শুধু অনন্তনারায়ণ আর পিয়ারাবাঈ। পিয়ারাবাঈ শুধু-গলায় গান শোনান গুন্‌গুন্ কোরে। কোনোদিন কীর্ত্তন, কোনদিন রামপ্রসাদী, কোনদিন বা বিদ্যাপতির পদ। তারপর রাত যখন দশটা বাজে, গান যখন থামে,—নিজের হাতে মধু দিয়ে নরহরি কবিরাজের ওষুধ মেড়ে এগিয়ে দেন পিয়ারাবাঈ অনন্তনারায়ণের হাতে। তারপর ফিরে আসেন অনন্তনারায়ণ। ঘোড়ায় নয়, পাল্কীতে। আর ঘোড়ায় চড়তে পারেন না।

: বাবু।—আস্তে আস্তে ডাক দেন নায়েবমশাই।

: উঁ?—চমকে ওঠেন অনন্তনারায়ণ।

: আজ না হয় হিসেবটা থাক্ হুজুর।

রায়বংশের একমাত্র বংশধর দর্পনারায়ণের বিয়ের ফর্দ্দ করছিলেন অনন্তনারায়ণ নায়েবের সঙ্গে। করতে করতে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছেন!

: কেন? থাকবে কেন নায়েব?

: আজ আপনাকে কেমন অসুস্থ লাগছে।

অসুস্থ! শুধু আজ? সেই যেদিন নাচঘরের উৎসব-রাত্রে হৈমবতী চলে গেলেন একা একা, শেষ দেখাটুকুও না কোরে,—সুস্থ থাকার দিন সেইদিন থেকেই গেছে।

উঠে বসেন অনন্তনারায়ণ : নাও বলো। তারপর?

নায়েব আবার ফর্দ্দর কাগজ তুলে ধরেন : আলো-বরদার তিন দল।

: উঁ?

নায়েব কি বড্ড দূর থেকে কথা বলছেন?

: তিন দল আলো ধরেছি।

: ওটা পাঁচদল করো নায়েব।—তারপর?

: গোরার বাজনা দু-দল।

: সেই কম্বল-ঝোলানো পট্টি-বাঁধা ব্যাগ্‌পাইপওয়ালা হাইল্যাণ্ডারের দল,—তাও যেন থাকে।

বলতে বলতে চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে তাঁর নিজের বিয়ের দিনের ছবি। ব্যাগ্‌পাইপওয়ালা হাইল্যাণ্ডার গোরার বাজনার দল চলেছে আগে আগে। তারপর ঘোড়াসওয়ারেরা। তার পিছনে হাতীর পিঠে রূপোর হাওদায় বসে আছেন পিতা রণেন্দ্রনারায়ণ রায়;—বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু। তার পিছনে আছেন চতুর্দ্দোলায় তিনি নিজে। কচি মুখ,—গোঁফের আভা দিয়েছে সবেমাত্র। চতুর্দ্দোলার পায়ের কাছে বোসে আছে রতন ঢালী;—কুচ্‌কুচে কালো ছিপ্‌ছিপে দেহ, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, সারা গায়ে তেল যেন চক্‌চক্ করছে;—হাতে খোলা তলোয়ার। রতন ঢালী সঙ্গে থাক্‌লে ঠগী-ঠ্যাঙ্গাড়ে-ডাকাতের সাধ্যি নেই গণ্ডগোল করে

মাঝপথে। তারপর আছে মহেশঢুলির ঢাকঢোলের দল। বেশ মনে পড়ছে আজো অনন্তনারায়ণের,—মহেশঢুলি তার দলবল নিয়ে 'দাদা গো দিদি গো সোনার প্রিতিমে কেন জলে দিয়ে এলি গো'—র বোল্ বাজিয়েছিল ঢাকে। স্মৃতিরত্নমশাই ধম্‌কে উঠলেন,—'চোপ্ ব্যাটা! বিসর্জনের বাদ্যি বাজাচ্ছিস্?' এক হাত জিভ্ কেটে মহেশঢুলি বোল্ বদল করেছে আবার।

সেদিনকার সেই ঘটনা আজো হাসি ফুটিয়ে তোলে প্রৌঢ় অনন্তনারায়ণের ঠোঁটের প্রান্তে। একটু নড়েচড়ে বসে অনন্তনারায়ণ প্রশ্ন করেন: বাজনা ক'দল বললে নায়েব?

: আজ্ঞে দু'দল।

: ওটা তিনদল করো। আর সেই সঙ্গে আমাদের মহেশঢুলির ছেলে পবনঢুলির ঢাক-ঢোলের দলকেও বায়না দিও।

: হুজুর—

ইতস্ততঃ করতে করতে বলেই ফেলেন নায়েব: গোরার বাজনার সঙ্গে পবনঢুলির লাক্‌চড়াচড়টা কি ঠিক জমবে? সেটা যেন কেমন-কেমন শোনাবে না?

নিজের বিয়ের দিনে পবনঢুলির বাপ মহেশ ঢুলির সেই এক হাত জিভ্ কেটে বোল্ ফিরিয়ে নেওয়ার দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনন্তনারায়ণের। বলেন: তা শোনাক্, তবু ফর্দে ওদের নামটাও ধরো।—তারপর?

কিন্তু তারপর আর ফর্দ পড়া হয় না। হাঁউমাউ করে কেঁদে আছাড় খেয়ে অনন্তনারায়ণের পায়ের ওপর এসে পড়ে কোথা থেকে একটা মানুষ: বাবু গো বাঁচাও।

: কে রে? কেরে তুই? দ্যাখো কাণ্ড! আর ওঠ দেখি, তোর মুখখানা দেখি।

মুখ তোলে এবার মানুষটা।

: কে তুই?

: আজ্ঞে পঞ্চানন হুজুর।

: চিনলুম না। কোথায় থাকিস্? আমাদের এ-তিন গাঁয়ের তো নোস্।

: হুজুর গৌরগঞ্জ থেকে আসছি। গৌরগঞ্জে ঘর। দাস পাড়ায়।

তবু চিনতে পারেন না অনন্তনারায়ণ।

এবার এগিয়ে আসেন নায়েবমশাই : ঠাকুরের নাম কি?

: বাপের নাম শুধোচ্ছেন?—বাপ নেই। চেনেন তাঁরে আপনারা। ভবিচরণের ছেলে হুজুর আমি।

এতক্ষণে চিনতে পারেন নায়েব। অনন্তনারায়ণের দিকে ফিরে বলেন : সেই যে ভবিচরণ,—হরিশ ঠ্যাঙ্গাড়ের ছেলে ভবি, পাকানো গোঁফ, কপালের ডানদিকে একটা বড় আঁচিল ছিল, মাঝে মাঝেই আপনার কাছে হাত পেতে দাঁড়াতো। আপনি বলতেন, 'হাতের থাবা দুখানা দেখেছ নায়েব, অমন থাবা খালি রাখতে নেই; ভরিয়ে দাও, ভরিয়ে দাও!' তারই ব্যাটা এ।

এবার যেন কতকটা চিনতে পারেন অনন্তনারায়ণ : কিন্তু কাঁদছে কেন? কি চায় ও?

পঞ্চানন আবার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে : হুজুর গো, বাঁচান আমাকে। আমার ব্যাটার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি খেয়েছি হুজুর।

নায়েব ধমক্ দিয়ে উঠেন : হেঁয়ালী রাখ্, কান্না থামা। যা বলবার স্পষ্ট কোরে তাড়াতাড়ি বল্। হুজুরের শরীর ভাল নয়। কাজ রয়েছে অনেক।

সব কথা বলে পঞ্চানন। রক্ষিত মহাজনের বাড়ীতে সেদিন সকালে যা যা ঘটে গেছে সব বলে সে কাঁদতে কাঁদতে। বলে : তাইতেই তো আমি আমার সবার ছোট ব্যাটা গোপ্লার মাথায় হাত দিয়ে শপথ করলাম,—সাতদিনের মধ্যে ওর সব টাকা আমি শোধ কোরে দেব যেমন কোরেই পারি। কাল রাতের মধ্যে টাকা দিতে না পারলে……

নায়েব ধম্‌কে ওঠেন : তা হঠাৎ এমন মাথা গরম কোরে দিব্যিটা গাললে কেন?

অন্যায় হয়ে গেছে। অন্যায় হয়ে গেছে, সে কথা এখন বেশ বুঝতে পারছে পঞ্চানন। কিন্তু—

: রক্ষিতকত্তা যে তখন বড্ড একটা খারাপ ইঙ্গিত কোরে বসলো আমার ব্যাটার বৌয়ের নামে। তাইতেই রক্তটা কেমন ফুটে উঠে মাথাটাকে একেবারে গোলমাল কোরে দিলে।

আবার ধমক্ দেন নায়েব : ছেলের মাথা ছুঁয়ে অতবড় একটা দিব্যি গালবার সময় একবার মনেও হল না যে, টাকাটা জোগাড় হবে কোত্থেকে?

: মনে হয়েছিল কত্তা। একবার মনে হয়েছিল। কিন্তু রাগের মাথায় দিব্যিটা তখন গালা হয়ে গেছে। তারপর পাগলের মত ইদিক্-সিদিক্ কদিন ঘুরে যখন অন্ধকার দেখছি চোখে,—হারাণের মা মনে করিয়ে দিলে,—আমাদের ভুবনপুরের হুজুর আছেন। সেই ভরসাতেই……

ভুবনপুরের হুজুর !—চোখে জল এসে পড়ে নায়েবের। দু' দুটো মহালের পাটা বাঁধা দিয়ে রক্ষিত মহাজনেরই কাছ থেকে টাকা ধার কোরে আনতে লোক পাঠিয়েছেন আজই সকালে। এখনো সে ফেরেনি। বিয়ের ফর্দ্দ ছোট-খাটোই করেছিলেন নায়েব মশাই। যা রয় সয়। ঘটাও হয়, আবার ভাঁড়ারে টানও না পড়ে। অনন্ত নারায়ণ ফর্দ্দ ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছেন। তাঁর বিয়েতে যা যা হয়েছিল, ছেলের বিয়েতে সব ঠিক তাই তাই হওয়া চাই। এক চুল এদিক-ওদিক চলবে না। যতক্ষণ না রক্ষিত মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে লোক আসছে ফিরে, ততক্ষণ বিন্দুমাত্র সোয়াস্তি নেই নায়েবের মনে। এই ভুবনপুরের হুজুরের ভরসায় আজো এরা দিব্যি গালে বোকার মতো।

বাষ্পরুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে নায়েব শুধু বলেন : পঞ্চানন ফিরে যা।

নিশ্চলভাবে চক্ষু মুদ্রিত কোরে আনন্তনারায়ণ শুধু গড়গড়ায় টান দিয়ে চলেন। মনে হয়, তিনি যেন কোন্ সুদূরে হারিয়ে গেছেন। তিনি যেন এ-ঘরে নেই।

পঞ্চানন কেঁদে বলে : কত্তা, আমার বাপ-দাদা আপদে-বিপদে কেউ কখনো ফেরেনি রায়বাড়ী থেকে শূন্যি হাতে।

সে কথা কি নতুন কোরে শুনতে হবে নায়েব মশাইকে এই পঞ্চানন দাসের মুখ থেকে? নায়েবকেই কি এর আগে কোনোদিন এমন কোরে কাউকে বলতে হয়েছে, বাড়ী যা তুই, বাড়ী যা?

শিউরে ওঠে পঞ্চানন : কিন্তু আমার ছেলেটা যে মরে যাবে। মাথায় হাতে দিয়ে শপথ করেছি, কাল রাতের মধ্যে সবটাকা শোধ করবো। না পারলে গোপ্‌লা যে আমার মরে যাবে কত্তা।

নায়েব চুপ্ কোরে থাকেন।

পঞ্চানন এবার অনন্তনারায়ণের দিকে ফিরে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে : হুজুর, হুজুর আপনারও কি এই মত ?

পঞ্চাননের কান্না অনন্তনারায়ণের কানেও পৌঁছায় না বুঝি !

পঞ্চানন কেঁদে বলে : টাকাটা আমি ভিক্ষে চাইছি না হুজুর। ধার দিন। দু'বছরের মেয়াদে। নৈলে গোপ্‌লা আমার মরে যাবে যে হুজুর।

উত্তর আসে না কোন হুজুরের কাছ থেকে। নায়েবমশাই শুধু ধরা-ধরা গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলেন : অন্যত্র চেষ্টা কোরে ছাখ্ পঞ্চানন।

উঠে দাঁড়ায় পঞ্চানন। গোলমাল হয়ে গেছে তার সব। গোপ্‌লাকে যম নেবেই নেবে। নৈলে ভুবনপুরের রায়বাড়ী থেকে খালি হাতে ফিরতে হয় পঞ্চাননকে! গোপ্‌লার কচি মুখখানা ভেসে ওঠে পঞ্চাননের চোখের সামনে। ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোতে থাকে পঞ্চানন। যেতে যেতে হঠাৎ চীৎকার কোরে কেঁদে উঠে বলে : পঞ্চাননের সাত সাতটা ব্যাটা,—গেলই বা, গেলই বা একটা মরে!

পঞ্চাননের কান্নাকে ছাপিয়ে সেই মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হয়ে ওঠে অনন্তনারায়ণের গম্ভীর কণ্ঠস্বর : পঞ্চানন!

চম্‌কে ফিরে দাঁড়ায় পঞ্চানন। শুনতে পায়, নিশ্চল সেই পাথরের মূর্ত্তির মুখ থেকে ভেসে আসছে ভাবলেশহীন আজ্ঞা : নায়েব, পঞ্চাননকে বোলে দাও আজকের রাতটা আমার অতিথশালায় থাকতে। কাল সকালে টাকা পাবে।

মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে পঞ্চানন : হুজুর, হুজুর গো!

অনন্তনারায়ণ তাকিয়া ছেড়ে এবার উঠে বসেন : পঞ্চাননকে অমন কোরে কাঁদতে বারণ কোরে দাও। আমার ভাল লাগছে না।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান অনন্তনারায়ণ। এগিয়ে যান খোলা জানালাটার দিকে। বাইরের কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলেন : আর, বোলে দাও পঞ্চাননকে যে, ধার নয়, টাকাটা ভিক্ষে বলেই নিতে হবে। ভুবনপুরের রায়েরা মহাজনী কারবার করে না।

ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে পঞ্চানন : হুজুর গো, মা-বাপ্ তুমি আমাদের, গরীবের দেব্‌তা তুমি।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়েই ধমক্ দিয়ে ওঠেন অনন্তনারায়ণ : কতোবার বলবো নায়েব যে, পঞ্চাননের কান্নাটা ভাল লাগছে না আমার। যেতে বলে দাও ওকে।

চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায় পঞ্চানন। যাবার আগে আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে যায় ভুবনপুরের রায়কে।

পঞ্চানন চলে যেতেই নায়েব পিছনে এসে দাঁড়ান। কম্পিতকণ্ঠে বলেন : এ কী করলেন

: কেন ?

অনন্তনারায়ণের দৃষ্টি তখনো সেই বাইরের অন্ধকারের দিকে।

: অতগুলো টাকা···এসময়ে···টাকা কোথায় ?

: কেন ? কেশব রক্ষিতের কাছ থেকে টাকা ধার কোরে আনতে পাঠানো হয়নি ?

: হয়েছে। কিন্তু···

: কুলোবে না ?

জবাব দিতে পারেন না নায়েব। 'না' একথাটা কেমন কোরে

উচ্চারণ করেন আজ এই প্রৌঢ় জমিদারের সামনে! অতবড় নিদারুণ সত্যটাকে কি কোরে মেলে ধরেন!

অনন্তনারায়ণের প্রশ্নের জবাবেই সেজের আলোটা কাঁপতে থাকে যেন থরথর কোরে!

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে অবস্থাটাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করেন অনন্তনারায়ণ। তারপর ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলেন: গোরার বাজনা না হয় নাই বাজবে নায়েব। না হয় নাই হবে…

থেমে যান অনন্তনারায়ণ। তারপর কম্পিত আলোক-শিখাটির দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে বলেন: ঐতেই সব কুলিয়ে নিতে হবে নায়েব। পঞ্চানন যেন টাকা পায় কালকের মধ্যে। আর, অতগুলো টাকা,—সঙ্গে একটা পাইক্ দিও।

পাইকের দরকার হয়নি পঞ্চাননের। হরিশ ঠ্যাঙ্গাড়ের নাতির পাইকের দরকার হয় না। পরদিন সন্ধ্যার একটু পরেই পৌঁছেচে নিজের গ্রামের সীমানায়,—গৌরগঞ্জে। সোজা রক্ষিত মহাজনের বাড়ীতে গিয়ে টাকাগুলো ফেলে দিয়ে তবে সে ঘরে ফিরবে। আলের আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে হাঁটতে থাকে পঞ্চানন আঁধারের মধ্যেই। হঠাৎ ওপাশের আখের ক্ষেতের মাঝে আলোর মতন কি যেন চোখে পড়ে তার।—এমন সময় আলো কিসের ওখানে ?—কৌতূহলী হয়ে মাঠের মধ্যে নেমে এগিয়ে যায় পঞ্চানন। চেনা চেনা গলার আওয়াজও যেন শুনতে পায় সে এগোতে এগোতে।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। রক্ষিত মহাজনের কণ্ঠস্বরটা এবার স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে ;—কিন্তু আরেকটি গলা কার ?

আখের পাতা সরিয়ে আল্‌তো উঁকি মারে পঞ্চানন। ক্ষেতের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা ; সেখানে দাঁড়িয়ে রক্ষিত মহাজন। আরেকজন কে ? পাশের গাঁয়ের কাদের মিঞা না ? সে আবার মুস্কিল আসান সেজেছে কেন ? পঞ্চানন গা ঢাকা দিয়ে চুপিসাড়ে কান পাতে। কাদের মিঞার হাতের চেরাগটা একরাশ ভুষো উড়িয়ে জ্বলতে থাকে মাঠের মধ্যিখানে।

রক্ষিতের কণ্ঠস্বর শোনা যায় : পঞ্চানন ফিরেছে ঘরে ?

: আজ্ঞা না কত্তা। —কাদের মিয়ার গলা।

: জানতুম মিয়া,—সে যে এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরবে না, তা আমি জানতুম।—সেদিন সকালে ব্যাটা তেজ দেখিয়ে বড় দিব্যি গেলে গেল কি না।—শোধ আমি করাচ্ছি ওকে টাকা।—তা কোথায় গেছে জানতে পারলে কিছু ?

: না, উয়ারা নিজেরাই জানে না। পুরুষ মানুষ তো আর নাই কেউ ঘরে।

: কেন ছেলেরা ?

: ছেলেদের মধ্যে আছে শুধু ঐ গোপালটা। আর সব গেছে বাপেরে খুঁজতে হেথায়-হোথায়।

: তাহলে তো সুবিধেই হয়েছে আজ।—তোমার ঐ চেরাগে তেল কতোটা আছে মিঞা ?

: কেন ? জ্বলতেছে তো।

: ও তো আলো জ্বলছে।—আগুন জ্বল্‌বে বলতে পারো ?

: ঠিক বুঝলাম না তো কত্তা ?

: ব্যাটা পঞ্চানন সেদিন বড় কড়া কড়া কথা৹ শুনিয়ে গেছে। —বলতে বলতে হাঁপায় রক্ষিত মহাজন ?

: আজ্ঞে ত্যাসের কথা কি যেন শুধোচ্ছিলেন।

: তোমার চেরাগে যে তেল আছে, তাতে পঞ্চাননের ঐ কুঁড়েটা দরকার হলে পুড়বে বলতে পারো ?

: কি যে বলেন কত্তা!—এক হাত জিভ কাটে কাদের মিঞা: আমার এ চেরাগ পবিত্তির জিনিষ। এয়ার আলোয় বিপদের আঁধার ঘোচে। এয়ার ভূষা-কালির টিপ-এ কপালের দুঃখ খণ্ডায়।

বাঁকা হাসে রক্ষিত: ঐ চেরাগের আলোয় কখনো কোথাও আগুন লাগেনি মিঞা ?

মাথা চুলকোয় কাদের মিঞা: আজ্ঞে লাগে নাই, এমন কথা আর বলি কেম্‌নে ; তবে—

: আচ্ছা পরে হবে একদিন সে হিসেব। আজ ওদিকের কাজ কতদূর করলে বলো ?

: উয়াদের উঠানে গিয়ে হাঁক্ দেলাম,—ইয়া পীর মওলা, মুস্কিল আসান্ হ্যায়।

: শুনে এল হারাণের বৌটা ?—রক্ষিত মহাজনের লোভাতুর কণ্ঠ।

: এল। মাথার কাপড়টা নামিয়ে দাঁড়াল এসে। মুখখানি ঝম্ঝম্ করছে কান্নায়। বললে,—'বাবা কদিন থেকে টাকার জন্যে নিখোঁজ। মা শয্যে নিয়েছেন। আমাদের বিপদ কাটিয়ে দাও মুস্কিল আসান।'—তারপর রাঙ্গা হাতখানি দেল বাড়ায়ে।

: তুমি কি কর্‌লে ?

: আমি ?—দেলাম পাতায় মুড়ে চেরাগের কালি।

: তারপর ?

: বললাম,—মাগো, চক্ষের জল মোছ। আল্লা তোমার শ্বশুরে ফিরায়ে দেবেন।

: আঃ।—তারপর ?

: তারপর ফিরে আলাম।

: ফিরে এলে ?—চুপিচুপি যে কথাটা বলতে বলেছিলুম, বলোনি ?

: পারলাম কৈ ?

: মানে ? পারা-পারির আছে কি ? অত কাছে পেয়েও কথাটা বলতে পারলে না ?

: চেরাগের কাঁপা-কাঁপা আলোয় মুখখানা তার কেমন ধারা যে হয়ে উঠল ;—সেই নোংরা কথাটা তার সামনে আর উচ্চারণ করতে

পারলাম না !—বলতে বলতে কেঁপে কেঁপে ওঠে মুস্কিল আসানের কণ্ঠস্বর।

আঃ! বিরক্তি ও আক্ষেপে ফেটে পড়ে রক্ষিত মহাজন : এমন একটা চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করলে তুমি মিঞা ?—উফ্—শোনো,—কাল আবার যেয়ো, বুঝলে ? কাল কিন্তু কথাটা বলা চাই।

ঘাড় নাড়ে মিঞা। কাল সে বলবেই। নিশ্চয়ই বলবে। শুধু চেরাগের আলোটা কাল নিবিয়ে দিয়ে যাবে সে। নৈলে ঐ চেরাগের আলোতে হারাণের বৌয়ের মুখখানা কেমন ধারা যে হয়ে ওঠে,—নোংরা কথা যে আর উচ্চারণ করাই যায় না !

কাদের মিয়া বিদায় নিয়ে ফিরে যায় ডান্‌ ধারে। রক্ষিত বাঁ-ধারে ফেরে। যাবার সময় আরো একবার মনে করিয়ে দেয় : কাল কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত চাই মিঞা।

মাঝপথে হঠাৎ কে যেন রক্ষিতের পথ আগলে দাঁড়ায়! কালো বুকের ছাতিটা হাপরের মতো উঠছে নামছে। চোখে আগুনের চুল্লীর হল্কা

: কে ?—চীৎকার করে ওঠে রক্ষিত।

কোনো সাড়া আসে না। শুধু শক্ত দুখানা হাত এগিয়ে এসে সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরে রক্ষিতের শীর্ণ কণ্ঠদেশ।

কিছুক্ষণ ঝাঁকুনি দিয়ে সাঁড়াশীটা আলগা হতেই রক্ষিতের শীর্ণ দেহটা লুটিয়ে পড়ে আখের ক্ষেতের আলের ধারে। তারপর গড়িয়ে পড়ে ক্ষেতের মধ্যে।

শিউরে ওঠে পঞ্চানন।

মরে গেল নাকি রক্ষিত মহাজন!—উত্তেজনার মাথায় এ কী করে বসলো সে!—মারতে তো সে চায় নি। চেয়েছিল জানিয়ে দিতে যে, হরিশ ঠ্যাঙ্গাড়ের বংশের বৌয়ের দিকে কু-নজর দেবার চেষ্টা করলে তার ফলটা কি হতে পারে। হাঁপানীর রুগীটা এই সামান্য ঝাকুনিতেই যে এমন করে…।

রক্ষিত মহাজনের ভূলুণ্ঠিত দেহটার পাশে উবু হয়ে বসে তাড়াতাড়ি তার নাকের তলায় হাত রাখে পঞ্চানন। নাঃ—এখনও শ্বাস বইছে যেন একটু একটু। বেঁচে আছে বোধহয় এখনো। হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকি এখনো বুঝি একেবারে যায় নি থেমে।

পঞ্চানন টাকার থলিটা নামিয়ে রাখে রক্ষিত মহাজনের জীর্ণ বক্ষপঞ্জরে ওপর। তারপর রক্ষিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বলে: তোমার সব দেনা শোধ করে দিয়ে গেলাম রক্ষিত কত্তা,—বুঝে নিও।

বিস্তীর্ণ মাঠের অন্ধকারে পঞ্চাননের কথাটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। রক্ষিতের দেহটা একটু যেন নড়েচড়ে ওঠে। সেই অন্ধকার ক্ষেতের ধারে রক্ষিতের দেহটাকে ফেলে পঞ্চানন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায়।

সারা ভুবনপুর আজ মেতে উঠেছে আনন্দে ;—দর্পনারায়ণের বিয়ে। রায়বাড়ী থেকে খবর এসেছে,—গেল সনের খাজনা মুকুব ; নেমন্তন্ন সকলের।

নহবংখানায় নহবৎ বেজে চলেছে সেই সকাল থেকে।—বারোয়ারীতলায় সঙের পুতুল সাজানোর ধুম্ পড়ে গেছে কুমোরদের। শিবের বিবাহের গল্পটা নানা পুতুল দিয়ে ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। ছেলের দল কানাৎ-এর ফাঁক্-ফোকরে উকিঝুকি মেরে পুতুলগুলোকে কে আগে দেখে নিতে পারে তারি হল্লা জুড়ে দিয়েছে।

ঠাকুরবাড়ীর মস্ত উঠোনে বেদী তৈরী হয়েছে কথক ঠাকুরের। বামনাবতার পালা গাইবেন তিনি।

বলরাম সাহার যাত্রাদলের আড্ডা জমেছে কাছারি বাড়ীর পেছনে সাবেকী রান্নাবাড়ীতে।

মহলার আর শেষ নেই তাদের। রায়বাড়ীর বায়না,—ঠাট্টা তো আর নয়। শ্রীরাধিকার পার্ট করছে যে ছেলেটি, বেউলোর সঙ্গে গান সেধে চলেছে সে,—'ননদিনী গো! বলো নগরে। ডুবেছে রাই রাজ-নন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।' অধিকারী বলরাম সাহা মেডেল গুলোকে খড়ি-তেঁতুল দিয়ে পরিস্কার করছেন নিজে হাতে। পাকস্পর্শের দিন মেডেলগুলো বুকে এঁটে যাত্রার আসরে দাঁড়াতে হবে তো গিয়ে।

ওদিকে পাঁচালীর দলের মূল-গায়েনকে ঘিরে বসেছে গ্রামের রসিক ছোকরার দল : দাদাগো, একবার সেই ছিদ্র কুম্ভে জল

আনবার সময় জটিলার উক্তিটা শোনাও। সেই যে—'আমাদের সে কাল ছিল এখনকার আবাগীগুলো, লজ্জা নাই, সজ্জা নিয়েই কথা,'—সেই জায়গাটা। মূল-গায়েন গুন্‌গুন্‌ করে গেয়ে উঠছেন,—

'হয়ে কুলের কুলবতী, নিক্‌সি-পেড়ে চিকণ ধুতি,
ঠোঁট রাঙ্গিয়ে সর্ব্বদা মুখ-তেলা।
মিছে মিছে যায় মুখ লুকিয়ে, আড়ে-আড়ে আড় চোখে চেয়ে,
মুখ দেখিয়ে, বুক চিতিয়ে চলা॥
মাথায় আরমাণী খোঁপা, চার দিকে তার বেড়া চাঁপা
ঝাপ্‌টা-কাটা কান-ঢাকা সব চুল।
পথে যেন ছবি নাচায়, ছোঁড়ারা ফিরে ফিরে চায়,
এতে কি থাকে কুল-কামিনীর কুল॥

বৃদ্ধের দল জাঁকিয়ে বসেছেন বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপ। কেউ বলছেন—এই মাত্র তিনি নাকি শুনে এসেছেন যে, মেঠাইয়ের একটা পাহাড় হবে খাসমহলের উঠানে। কেউ বলছেন,—পাহাড় একটা হবে বটে, কিন্তু সেটা মেঠাইয়ের নয়, সন্দেশের। কেউ বলছেন,—শুধু পাহাড়ই নয়, সে পাহাড়ের একটা ঝর্ণা থাকবে, আর সে ঝর্ণা দিয়ে ঝরে পড়বে ক্ষীর। রসনাসিক্তকর এইসব কথার ফাঁকে ফাঁকে হাতে হাতে ঘুরে চলেছে হুঁকো। বেলা চলেছে বেড়ে।

বর্দ্ধমানের শশী গয়লানীর কবির দল এসেছে কবির গান গাইতে। শশিমুখী গোপ-কন্যা হলেও সুন্দরী এবং নৃত্য-গীত-কুশলা। সঙ্গে

আরো কটি সুন্দরী মেয়ে আছে। তাদের ফাই-ফরমায়েস্ খেটে ধন্য হবার জন্যে ঘুর্-ঘুর করছে একদল ছোক্‌রা কাছারিবাড়ীর আশে পাশে।

অষ্টভূজার মন্দিরের চাতালে আভ্যুদয়িকের কাজে বসেছিলেন অনন্তনারায়ণ। কাজ সেরে উঠে খবর নিলেন চতুর্দ্দোলার।

নায়েব জানালেন : চতুর্দ্দোলা সাজানো শেষ হয়ে গেছে।

: খোকা কোথায় ?

: দর্প ?—তাঁর নিজের ঘরে হুজুর।

: তার দিকে হুঁশ রেখো নায়েব। মুখটা সকালে কেমন শুকনো দেখলুম। দুপুরবেলাটা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিও তাঁকে। বরযাত্রী কে কি ভাবে যাবে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছ ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: ঠিক আছে।

অনন্তনারায়ণ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

নিজের ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ায় দর্প। হাতে তার বিয়ের ডোর বাঁধা। দূরে দেখা যায় বাঈমহলের জানলায় দাঁড়িয়ে আছে রত্না।

খাস্‌মহলের বাতায়নে দর্প,—বাঈমহলের বাতায়নে রত্না,—মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঢং—ঢং কোরে ঘণ্টাগুলোকে বাজিয়ে চলে ঘণ্টাকর্ণক।

দুপুর গড়িয়ে বেলা শেষ হয়ে আসে।

নিজের ঘরের বাতায়নের সমুখে দাঁড়িয়ে রত্নার মনে হয়, সেদিন সন্ধ্যায় দর্পর সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে এদেশ এ-সমাজ ছেড়ে পালিয়ে গেলেই বোধ হয় নিজের প্রতি এবং দর্পর প্রতি সুবিচার করতে পারতো সে।

বেলা গড়িয়ে যায়। দাসী এসে ডাকে : চুল বাঁধতে এসো গো দিদিমণি।

সন্ধ্যায় প্রসাধন সমাপন করে রত্না যখন বাঈমহলের ঝুল্-বারান্দায় এসে দাঁড়াল,—দূরের খাস্‌মহল তখন ঝল্‌মল্ করছে ফুকো-শিশির রঙ্-বেরঙের কাঁপা-কাঁপা আলোয়। রায়েদের নহবৎখানায় সানাই বেজে চলেছে ইমন-ভূপালীতে। আর ঘণ্টা-খানেক পরেই খাস্‌মহল থেকে চতুর্দ্দোলায় বর যাবে বিয়ে করতে। বরযাত্রার আয়োজনের অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যাচ্ছে এখান থেকেই।

বাঈমহলের অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রত্না চুপ্‌চাপ তাকিয়ে ছিল খাস্‌মহলের দিকেই,—হঠাৎ পিঠে কার হাতের ছোঁয়া লাগতেই চম্‌কে উঠে পিছন ফিরে দেখলে দর্প দাঁড়িয়ে আছে বর বেশে।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না রত্না। তারপরেই নিজেকে সামলে নেয় তাড়াতাড়ি—

: ওমা, তুমি!—তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি এখানে ঝুঁকে; চতুর্দ্দোলায় বর যাবে,—দেখবো। ওমা, কপালে চন্দন দিয়ে বর নিজেই এসে হাজির।

রত্না যথাসাধ্য সহজ ভঙ্গিতেই কথা বলার চেষ্টা কোরে চলে : চন্দন কে পরালে গো ?—আহা, আর একটু সরেই দাঁড়াও না আলোর সামনে ;—দেখি বরটিকে কেমন মানিয়েছে।

রত্নার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দর্প। যেন পড়ে নিতে থাকে তার মনটাকে। তারপর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলে : রত্না, চোখের জলটা ভুলে গেছ মুছতে।

: কৈ,—বারে ! রত্না হাসবার চেষ্টা করে প্রাণপণে।

: নিজেকে তুমি সবার কাছ থেকে লুকোতে লুকোতে নিজের কাছ থেকেও লুকোতে চাও ?—মুছে নাও চোখের জলটা।

কান্নাটাকে আড়াল করবার জন্যে মুখ আড়াল করে রত্না তাড়াতাড়ি।

দর্প বলে : কান্নাটাকে অত কষ্ট করে আড়াল করবার কোন দরকার নেই রত্না। ভুবনপুরের রায়বাড়ী জুড়ে আজ সানাই বাজছে ;—তোমার কান্না কেউ শুনতে পাবে না।

একটু থামে দর্প। তারপর আলোর সামনে সরে এসে বলে : আমি আলোর কাছে সরে এসে দাঁড়িয়েছি রত্না। দেখবে না, বরটিকে কেমন মানিয়েছে ?

রত্না তাকায়।—সমস্ত শরীরটা দুলতে থাকে তার উত্তেজনায়।

কেন এসেছে দর্প এমন সময় এখানে ? কী বলতে এসেছে ও' ? কি চাইতে এসেছে ?—আজ যদি আবার ও' সেদিনের সন্ধ্যার মতো বলে,—'নিচে ঘোড়া তৈরী আছে' ? কী উত্তর দেবে রত্না তাহলে ?—ফিরিয়ে দেবে ?—জীবনের এই গোধূলি-মুহূর্তে কী বেছে নেবে রত্না ?—পুরোনো ঐ বন্ধ্যা দিনটাকে ? না, নক্ষত্রবতী নতুন রাত্রি ?

—পারবে না, পারবে না,—আজ এই মুহূর্তে পারবে না রত্না ফিরিয়ে দিতে দর্পকে।

: বলো, বলো দর্প, কী তুমি চাও? কী চাইতে এসেছ তুমি আমার কাছে?

কথা কটি এক নিঃশ্বাসে বলেই নিশ্চুপ্ হয়ে যায় রত্না হঠাৎ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে দর্প নিতান্তই অনুত্তেজিত প্রশান্ত কণ্ঠে বলে : তোমার আতরদান থেকে একটু গোলাপী আতর লাগিয়ে দেবে রত্না আমার এই রুমালে?

স্বপ্নাবিষ্টের মতো দর্পর হাত থেকে রুমালটা নিয়ে রত্না নাচঘরের দিকে ফিরে যায়। ঝুল্-বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে থাকে দর্প; আর, বারান্দায় ঝোলানো তেলের আলোটা। তার শিখাটাও একটুও কাঁপছে না।

ফিরে যায় দর্প রুমালে গোলাপী আতরের সুবাস নিয়ে। কিন্তু শুধু ঐ গোলাপী আতরটুকুর জন্যেই কি আজ এই অসময়ে এসেছিল সে এখানে?

রত্না আবার দাঁড়ায় একা বারান্দায়। চুপচাপ, শুধু চোখ মেলে দিয়ে অন্ধকারে।

কিন্তু হয়ে গেল তো অনেকক্ষণ,—ঘণ্টাফটকে সন্ধ্যে সাতটার ঘণ্টা বাজলো না তো এখনো! চিন্তিত হয় রত্না।

ভিতর থেকে ছুটে আসেন পিয়ারাবাঈ : রতন, সন্ধ্যে সাতটার ঘণ্টা বাজতে শুনেছিস?

: না তো পিসিমা।

বলতে বলতে শঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে যায় রত্না। তাকায় খাস্‌মহলের দিকে।

কৈ বরযাত্রার কোলাহল তো শোনা যাচ্ছে না আর। খাস্‌-মহলের আলোগুলোও নিষ্প্রভ হয়ে গেল নাকি সব?

পিয়ারাবাঈ অস্থির হয়ে ওঠেন: হ্যাঁরে, আলো বরদারের আলোগুলো জ্বলছে কি?

: না পিসিমা।

: সানাই-এর শব্দ পাচ্ছিস শুনতে?

: না পিসিমা।

: ওরে,—পাঠা সকলকে ঘণ্টাফটকে। যে কোরে হোক্ ঘণ্টা যে বাজাতেই হবে,—ঘণ্টা যে বাজাতেই হবে!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন পিয়ারাবাঈ সেইখানেই!

সে-রাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কেউ বাজাতে পারলো না ঘণ্টাফটকের অষ্টধাতুর ঘণ্টা!

* * *

বিন্দুবাসিনী দেবীর ঘরে তাঁর প্রকাণ্ড তৈলচিত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে অনন্তনারায়ণ যখন দর্পকে আশীর্ব্বাদ কোরেছেন, তখন কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে যাবে।

একমাত্র ছেলের বিয়ে। কতদিন পরে গোঁফটিকে একটু পাকিয়েছেন, কতদিন পরে আবার কাঁধে ফেলেছেন সেই দশ সের

ওজনের জরির জামিয়ারখানা, কতদিন পরে সোনা-বাঁধানো হাতির দাঁতের ছড়িটিতে হাত দিয়ে হেসেছেন একটুখানি। তারপর দিব্যিই তো নামছিলেন পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নায়েব মশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। হঠাৎ ঝুপ্ কোরে যেন বসে পড়লেন সিঁড়িতে,—তারপর কেউ ধরবার আগেই গড়িয়ে পড়লেন দুটো তিনটে ধাপ। তারপর?…

অনন্তনারায়ণের শয্যা পার্শ্বে চুপ্ কোরে বসেছিল দর্প।

আস্তে আস্তে ভিড় কমে গেল। চলে গেল বাজনদারের দল, চলে গেল আলো-বরদার, চলে গেলেন বরযাত্রীরা। বন্ধ হয়ে গেল বারোয়ারী-তলার যাত্রা গান, চপ্-কেত্তন; সঙের নাচ আর তরজা গান। নিভে গেল একে একে রায়বাড়ীর সব আলো। শেষ অবধি নায়েবমশাইও বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। শুধু দর্প একা।

এ ক'দিন দর্প ক্রমাগতই ভেবেছে, এমন একটা অভাবনীয় কিছু হয়ে যায় না, যাতে তার বিয়েটা হঠাৎ যায় কেঁচে? ভগবানের কাছে প্রার্থনাও সে করেছে কতদিন।—কিন্তু তা কি এমনি কোরে? সে-ইচ্ছে কি এমনি কোরে পূরণ হল?

সেই একা ঘরে বোসে দর্পর মনে হল এ-ঘটনার জন্যে সেই যেন দায়ী। এই ঘটনার আয়োজনই যেন সে করেছিল মনে মনে। যেন তারই ইচ্ছায় ঘট্‌লো!—উফ্! পাগল হয়ে যাবে দর্প।

নায়েব আসেন। ধীরে ধীরে হাত রাখেন দর্পর পিঠে। আর্দ্র-কণ্ঠে বলেন: আর তো বসলে চলবে না বাবা। কাজ রয়েছে যে অনেক।

*　　　　*　　　　*

দিন কাটে। কাজ শেষ হয়।

দর্প বলে : সবই তো হোল নায়েবমশাই, এবার আমার বজ্‌রা সাজান।

নায়েব বলেন : কোথায় যাবে ?

দর্প বলে : দেখি।

বজ্‌রা তৈরী হয়।

এমন সময় পত্র আসে বাঈমহল থেকে। লিখেছেন পিয়ারাবাঈ কাঁপা কাঁপা অক্ষরে,—"একটা অনুরোধ। আমাকে বৃন্দাবনে পৌঁছে দেবে বাবা ?"

চম্‌কে ওঠে দর্প! তাই তো!—গোলমালে এ ক'দিন বাঈ-মহলের কথাটাই তো মনে পড়েনি একবারো। রুদ্ধকক্ষে একাকিনী পিয়ারাবাঈ যেখানে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন,—দাঁড়ানো হয়নি তো একবারো সেখানে গিয়ে! যে একটিমাত্র জায়গায় সান্ত্বনা মিলতো, সেই জায়গাটির কথাই যে আশ্চর্য্য ভাবে ভুল হয়ে গেছে! পিয়ারাবাঈ-এর কথা কেন ভুল হল ? এ-অপরাধ লুকোবার জায়গা নেই যে তার কোথাও!

যাবার দিন বাঈমহলে গিয়ে দাঁড়ায় দর্প। শুভ্রবসনা বিশীর্ণা পিয়ারাবাঈ-এর সামনে মাথা হেঁট্ কোরে দাঁড়িয়ে বলে : আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথা থেকে এসে টুক্ কোরে একটি প্রণাম করে রত্না। জিজ্ঞেস করে শুধু একটি কথা : কবে ফিরবে ?

দর্প বলে : কি জানি।

বজ্‌রা ছেড়ে যায় ভুবনপুরের ঘাট। বজ্‌রার জানালার ধারে বোসে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন পিয়ারাবাঈ ছেড়ে-আসা ভুবনপুরের দিকে। একটু একটু কোরে দূরে চলে যায় ভুবনপুর। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে ভুবনপুরের খাস্‌মহল আর বাঈমহলের গোম্বুজ, ঘণ্টাকর্টকের চূড়ো, এই দেখা যায়, এই যায় না। মনে হয় ওরা যেন অচেতন পদার্থ নয়, ওদেরও যেন প্রাণ আছে। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে ওরাও যেন যতক্ষণ পারা যায় দেখে নিচ্ছে পিয়ারাবাঈকে,—তাদের অনেক দিনের সুখদুঃখের দোসরটিকে।

বাঁক ফেরে বজ্‌রা। ভুবনপুর আর যায় না দেখা। বাঈমহলের নাচঘর থেকে অনেকদিনের একটি গান যেন স্মৃতির পবনে ভেসে আসে পিয়ারাবাঈ-এর কানে,—'হামে ছোড়ে চলে বেণীমাধো!'

অনন্তনারায়ণ এই গানটি শুনতে বড় ভাল বাসতেন!

আবার একটা বাঁক ফেরে বজ্‌রা।

আখের ক্ষেতের আলের ধারে রক্ষিত মহাজনের দেহটাকে ফেলে সেই যে ছুটেছিল পঞ্চানন উর্দ্ধশ্বাসে, সে-ছোটা থামিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল যখন, তখন পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখলে যে, শুধু অনেকখানি পথই নয়, অনেকগুলো দিনকেও পিছনে ফেলে এসেছে সে !

এবার সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালে নিজের দিকে।—জামা-কাপড় শুধু মলিনই নয়, ছিন্ন হয়ে এসেছে। তেল-জলের অভাবে মাথার চুলে পড়েছে জটা। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে পা-দুটো। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে শরীর।

প্রাণের ভয় পঞ্চাননকে এতদিন ধোরে এতখানি পথ দৌড় করিয়ে যখন ধূধূ মাঠের মাঝখানে এনে একটা বটগাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে, তখন পঞ্চাননের প্রথমেই মনে পড়ে গেল নিজের বাড়ীর কথা।

কেমন আছে সবাই ?

বাপের পাশটি না হলে ঘুম আসে না গোপ্‌লার চোখে,—পঞ্চানন নিজে হাতে কোরে জাব্‌না মেখে না ধরলে পেট ভরে না কালো গোরুটার,—কেমন আছে তারা ?

ধূধূ মাঠের মাঝখানে বটগাছের ছায়ায় একা দাঁড়িয়ে বাড়ীর জন্যে বড় মন-কেমন করতে লাগল পঞ্চাননের।

পঞ্চানন পিছু ফিরলো।

আরো অনেক দিন পর পঞ্চানন আবার যখন নিজের গাঁয়ের মাটিতে পা দিল, তখন বেশ রাত হয়েছে।

ঘোষেদের আমবাগান,—বারুইদের দীঘি,—বিষ্ণুরায়ের ঠাকুর-বাড়ী,—দ্বিজু ঠাকুরের টোল পেরোতে পেরোতে যতই এগিয়ে চলে পঞ্চানন, আনন্দে ও উত্তেজনায় ততই কাঁপতে থাকে শরীর-মন।

গোপলাটা নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে।—এত রাতে গিয়ে জাগাবে নাকি পঞ্চানন তাকে?—জেগে উঠে এতদিন পর বাপকে চোখের সামনে দেখে গোপ্‌লা কী করবে? আনন্দে কেঁদে ফেলবে, না অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেবে?…

বুড়ো শিবতলা।

নমস্কার করলো পঞ্চানন বুড়ো শিবকে।—ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল শরীর। শিবতলার পিছনেই বাঁশবাগান,—তার পিছনেই পঞ্চাননের বাড়ী।…

বাঁশবাগান।

পায়ে পায়ে শুক্‌নো পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে থাম্‌কে দাঁড়াল পঞ্চানন।—দ্রুত তালে চলতে চলতে থেমে গেল যেন হঠাৎ হৃৎপিণ্ড। চৌদুনে বাজতে বাজতে শমে পৌঁছবার আগেই ছিঁড়ে গেল যেন হঠাৎ বীণ-এর তার!

কোথায় পঞ্চাননের বাড়ী?

একটা ভস্মস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চানন! পায়ের তলায় পড়ে আছে আধ-পোড়া একটা কাঠের পুতুল;—গোপ্‌লার বড় আদরের কাঠের সেপাই!

পঞ্চাননের সমস্ত কুঁড়েটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে!

পোড়া ছাই মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যায় পঞ্চানন অভিভূতের

মতো। মনে হচ্ছে তার, এখনো যেন আগুনের তাপ লাগছে পায়ে, এখনো যেন আগুনের আঁচ লাগছে সর্বশরীরে।

কোথায় গেল এরা ?

গোবর্দ্ধন চাষী গুন্‌গুন্ কোরে গান গাইতে গাইতে ফিরছিল হরিসভা থেকে নিজের ঘরের দিকে। সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল পঞ্চানন : চিনতে পারো ?

চমকে উঠলো গোবর্দ্ধন : সত্যাই তুমি পঞ্চানন-দা ?

: হ্যাঁ,—আমি।

: একী চেহারা হয়েছে তোমার ?

: তার আগে বল্,—কবে হল এ-কাণ্ড ? কোথায় গেল এরা ?

গোবর্দ্ধন সহানুভূতির সুরে বলে : এমন পথে দাঁড়িয়ে কি কথা হয় পঞ্চানন-দা ?—এস, আমার ঘরে এস, মুখ-হাতে জল দাও, মুখে দাও কিছু ;—সব বলছি।

: না না। এইখানে আমার এই পোড়া-ভিটেয় দাঁড়িয়ে আমি শুনতে চাই সব কথা।—হাঁপাতে থাকে পঞ্চানন।

সেই রাত্রের অন্ধকারে পঞ্চাননের পোড়া-ভিটেয় দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন জানায় দুর্ঘটনার ইতিহাস।

জানায়, কেমন করে মৃত কেশব রক্ষিতের পুত্র নেপাল রক্ষিত জ্বালিয়ে দিয়েছিল পঞ্চাননের কুঁড়ে। জানায়, কেমন কোরে হাত-পা বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে নেপাল সকলকে। জানায়, কেমন কোরে নেপাল পরদেশী লাঠিয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছিল পঞ্চাননের কুঁড়ে,—

আগুন নেভাতে দেয়নি গাঁয়ের লোককে। জানায়, সেদিন শহর থেকে রোজগারের টাকা নিয়ে পঞ্চাননের বড় ছেলে হারাণও ফিরেছিল ঘরে,—সে পর্য্যন্ত পুড়ে মরেছে।

: কেউ বাঁচেনি? কেউ না?

পঞ্চানন কান্নার চেয়ে করুণ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে।

: একজন শুধু বেঁচে গেছে।—গোবর্দ্ধন বলে শান্ত কণ্ঠে।

: বেঁচে আছে! লাফিয়ে ওঠে পঞ্চানন। কাঁপতে থাকে তার চোখদুটো: কে? কে বেঁচে আছে? কোথায় আছে সে?—গোবর্দ্ধনের কাঁধ দুটো দুহাতে ধরে সজোরে নাড়া দেয় পঞ্চানন।

: হারাণের বৌ।

: আমার বৌমা!—কোথায়, কোথায় আমার মা?

: ঘরে এস পঞ্চানন-দা।—গোবর্দ্ধন হাত ধরে পঞ্চাননের।

: ওরে না,—আগে বল,—কোথায় আমার মা? তোর ঘরে ঠাঁই দিয়েছিস মাকে?

: না পঞ্চানন-দা।—গম্ভীর গোবর্দ্ধনের গলার আওয়াজ।

: তবে?—আমাকে নিয়ে চল তার কাছে।

: সে আছে বিবিগঞ্জে।

: বিবিগঞ্জ?

: হ্যাঁ,—বিবিগঞ্জে নদীর পাড়ে কোথায় বুঝি একটা পুরোনো সাহেবের বাড়ী কিনে সারিয়ে নিয়েছে—নেপাল রক্ষিত। সেইখানেই রেখেছে তাকে।

: গোবর্দ্ধন!—আগুনের মতো জ্বলতে থাকে পঞ্চাননের ক্রুদ্ধ চোখদুটো।

আর কোন কথা শুনতে চায় না পঞ্চানন। পোড়া-ভিটের ছাই তুলে নিয়ে নিজের বুকে মাখতে মাখতে হাউ-হাউ কোরে কেঁদে ওঠে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতটাকে শূন্যে উত্তোলিত কোরে বিড়বিড় কোরে কি একটা বলতে বলতে অন্ধকারে মিশিয়ে যায়।

দর্পর নৌকো ভুবনপুরের ঘাট ছেড়ে গেছে মাস আষ্টেক হবে। শরতের অপরাহ্ন। রতনবাঈ একা বসে ছিল বাঈমহলের নাচঘরে একটা বীণ্ হাতে নিয়ে। পিয়ারাবাঈ-এর খবর একটা পেয়েছে এর মাঝে। ভালই আছেন তিনি বৃন্দাবনে। কিন্তু দর্পর কোন খবর তাঁর জানা নেই। তাঁকে বৃন্দাবনে নামিয়ে দিয়ে সে যে কোথায় গেছে, জানেন না তিনি।

বড় ফাঁকা লাগে রতনবাঈ-এর। বড় একলা মনে হয়। কবে আবার ভুবনপুরের ঘাটে ফিরে আসবে ভুবনপুরের রায়েদের বজরা, —কবে আবার ভুবনপুরেরর মাটিতে পা দেবেন ভুবনপুরের রায়, কবে আবার বাঈমহলের নাচঘরে জ্বলে উঠবে সব কটা ঝাড়লণ্ঠন,—তারি অলস প্রতীক্ষায় সঙ্গীহীন দিন কাটে রত্নার।

বুড়ো নিতাই চাকর কেবলই কাছে কাছে থাকে। বড় আপনার জন সে। সেই ছোট্টবেলাটি থেকে ঐ নিতাই-এর কোলে পিঠে চড়েই তো ঘুরে বেড়িয়েছে রত্না।

নিতাই মাঝে মাঝে কোথা থেকে বাউলের দল ডেকে আনে। বলে: গান শোনো গো দিদি।

বাউল একতারায় ঘা দিয়ে নেচে নেচে গান গায়,—আমার মনের মানুষ যে, তাকে পাবো কোথায়?

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে রতনবাঈ-এর।

নিতাই আড়ালে ডেকে নিয়ে মৃদু ভর্ৎসনা করে বাউলকে: আর গান ছিল না বাপু তোমার? কি গানেরই ছিরি ছাঁদ। এমন গান জানো না, যাতে আমার দিদির মুখে হাসি ফোটে?

কোনদিন বা নিতাই ডেকে আনে 'দুই সতীনের ঝগড়া'।—দুই সতীনের কাঁপা পুতুল দুখানা,—কোমরে তাদের মস্ত ঝালর-দেওয়া ঘাগ্‌রা। সেই কাঁপা পুতুলের মধ্যে হাত দুটি পুরে দিয়ে গান গেয়ে আর হাত নেড়ে দুই সতীনের কোঁদলের 'সঙ্‌' দেখায় বুড়ো। যেমন তার হাত নাড়ার কায়দা, তেমনি দু'রকম গলা কোরে গান গাইবার ক্ষমতা।

বাঁ-হাতের পুতুলকে নেড়ে সরু গলায় গায়: ওলো, উঁচু-কপালী থ্যাবড়া-নাকী নাড়িস্‌নি আর ঠোঁট্‌।

তারপরেই ডান-হাতের সতীনকে নাড়িয়ে মোটা গলায় গায়: ওলো, সাম্‌লে চলিস্‌, গোদা-পায়ে লাগবে শেষে চোট্‌॥

শুনতে শুনতে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে রত্না।

নিতাই বুড়ো খেলোয়াড়টিকে ডেকে চুপি চুপি বলে: মাঝে মাঝেই আসবি। বুঝলি?

*　　　　*　　　　*

দর্পর নৌকা এসে লেগেছে তখন হরিশচন্দ্র ঘাটে। কাশীর গঙ্গার স্বচ্ছ স্থির জল। শরতের নির্মেঘ আকাশ। সাতদিন হল এই ঘাটে নৌকা বেঁধেছে দর্প।

নানা তীর্থের ঘাটে ঘাটে নৌকা বেঁধেছে দর্প। দেবদর্শনের চেয়ে মনুষ্যদর্শনই হয়েছে বেশী। নানা রকমের মানুষ তাদের নানা রকমের সুখ-দুঃখ নিয়ে সামনে এসেছে তার। মনের যে-বোঝা নিয়ে একদিন ভুবনপুরের ঘাট ছেড়েছিল দর্প,—সে বোঝা কখন্‌ যে হাল্কা হয়ে গেছে টেরও পায়নি সে।

একটা নেশার ঝোঁকে যেন ভেসে চলেছে দর্প। কেন চলেছে,

ঠিক মনে নেই আর ;—কোথায় চলেছে, স্পষ্ট ধারণা নেই তার সম্বন্ধেও।

: নাতির মুখে ভাত দিচ্ছ কবে দাদা ?

হরিশ্চন্দ্র ঘাটে স্নান করতে নেমেছেন দুই প্রৌঢ়। একজন জিজ্ঞেস করলেন আর এক জনকে।

: আর দিন পনেরো বাদে। গিন্নীর শখ্ পাঁচজনকে নেমন্তন্ন করেন। প্রথম নাতি তো।

পৈতে মাজতে মাজতে উত্তর দেন একজন।

: দিন দেখিয়েছ নাকি ভট্‌চাজকে ?

: হুঁ।—২রা কার্ত্তিক ভাল দিন আছে। ঠিক করেছি সেই দিনই ৺বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ করে······

আর কিছু কানে আসে না দর্পর। মনটা কেমন হু-হু করে ওঠে হঠাৎ।

২রা কার্ত্তিক !—১২ই কার্ত্তিক আবার এসে গেল এরি মধ্যে !—১২ই কার্ত্তিক !—বাঈমহলের প্রতিষ্ঠা দিবস !—রত্না ? রত্না কেমন আছে ?

*　　　*　　　*

নাচঘরে একা বসে সকালবেলা ওস্তাদজীর কাছ থেকে শেখা গৎটা বীণ-এ সবেমাত্র তুলতে বসেছে তখন রত্না, এমন সময় ছুটে আসে বুড়ো নিতাই : দিদি গো।

হাসে রতনবাঈ : কি রে নিতাইদা ? আজ আবার কাকে নিয়ে এলি ডেকে ?

: আজ একেবারে হৈহৈ ব্যাপার, রৈরৈ কাণ্ড।

আনন্দে নেচে ওঠে যেন নিতাই।

: সে আবার কি রে? কৌতুকে হাসে রত্নার চোখ।

: আগে বলো, কি দেবে?

: কি আর দোব?—কি এমন এনেছিস যে একগাদা দাম দিতে হবে তার জন্যে?—সেই তো বাউল গান, না হয় ভাল্লুক নাচ, নাহয়…

: তার চেয়ে অনেক দামী জিনিষ।

: কী সেটা?

: খোকাবাবু এবার দেশে ফিরছেন গো। এই নাও তোমার চিঠি। যাই সব্বাইকে বলে আসি গে।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চিঠিটা রত্নাকে দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যায় নিতাই। সব্বাইকে বলবার তাড়ায় নয় মোটেই; —চিঠিটা রতন দিদিকে একা একা পড়বার সুযোগ দেবার জন্যেই শুধু। আড়াল থেকে পর্দা সরিয়ে লুকিয়ে শুধু ছাখে,—চিঠিটা পেয়ে তার রতনদিদির মুখখানি কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

• দেহের সমস্ত রক্ত যেন এক লহমায় রত্নার কোমল মুখখানিতে এসে জমা হয়। দ্রুত হয়ে ওঠে নিশ্বাস-প্রশ্বাস। নেচে ওঠে সুর্মা-টানা চোখ-দুটি। রত্না চিঠি খোলে ব্যাগ্র হাতে।—

"রতন বাঈ, বাড়ী ফিরছি। দশমাস বাদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছি জেনে খুশী হচ্ছ নিশ্চয়ই?"

রত্না নিজের মনেই বলে: হচ্ছি কিনা জান না? ঢং!

আবার পড়ে—

"সামনেই ১২ই কার্ত্তিক। কোনো ১২ই কার্ত্তিকই উৎসব বাদ যায়নি বাঈমহলে; এবারেও যাবে না। ভাল কোরে বাঈমহল সাজিয়ো।

"কোথা থেকে কী ওলোট্ পালট্ হয়ে গেল রম্ভা, আজ আমি হয়ে উঠেছি খাস্‌মহলের বড় হুজুর দর্পনারায়ণ রায়, আর তুমি হয়ে উঠেছ বাঈমহলের পঞ্চমা মালিকান্, রতনবাঈ জয়পুরী।

"আমাদের প্রথম দেখা হবে সেই ১২ই কার্ত্তিকের রাত্রে। তার আগে নয়।—সেইদিন ঘন্টাফটকের ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে সাতটা বাজবে, তখন গোঁফের প্রান্তে মোমের পাক্ দিয়ে, কানে আতর গুঁজে, কস্তুরী-কিমাম-দার পান মুখে দিয়ে প্রথম বাঈমহলে ঢুকবে খাস্‌মহলের বর্ত্তমান কর্ত্তা রায় দর্পনারায়ণ,—রুমালে মোহর বেঁধে।

"তারপর গান হবে। ঠুংরী, আর চৈতী। রুমালে বেঁধে তোমাকে মোহর দেব ছুঁড়ে; তুমি বাঁহাতে কুর্ণিশ জানিয়ে আবার গান ধরবে,—"পানি ভরেরি কোন্ আল্‌বেলে কিনারে ছমাছম্।"

"তারপর রাত হবে অনেক। —সবাই যাবে চলে। শুধু থাকবো তুমি আর আমি। তখন কিন্তু ঘরে নয় আর, ঐ আমাদের সেই বাগানের ধারে। তখন আর কিন্তু রায়বাড়ীর বড় হুজুর নই আমি, —তুমিও নও রতনবাঈ জয়পুরী।—দর্প আর রম্ভা!

"তোমার হাতে থাকবে,—হেসো না,—আম্‌লকির আচার। ঠিক তো?"

রতনবাঈ অবার গোড়া থেকে পড়ে চিঠিটা,—"রতনবাঈ বাড়ী ফিরছি।"

রম্ভা বীণ্-এর তারে ঘা দেয়।

বৃদ্ধ নিতাই পর্দ্দার আড়ালে সজল চক্ষে দাঁড়িয়ে শোনে নাচঘর থেকে খুশীর সুর উঠেছে অনেক দিন পরে: মালনিয়া আব্ লাও মালা। ফুলনকি সেজ বিছাও, দুলহন্ আই ব্রিজবালা॥

বিবিগঞ্জের রাস্তায় কদিন থেকে দেখা যাচ্ছে একটি পাগলকে। ছিন্ন বসন, রুক্ষ চুল, অপরিচ্ছন্ন দেহ। লোকটি ভিক্ষে চায় না,— কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। কেবল বিড় বিড় কোরে কি উচ্চারণ করে, আর মাঝে মাঝে বদ্ধমুষ্টি শূন্যে ছুঁড়ে দেয়।

বিবিগঞ্জের নদীর ধারে ফরাসী এক কুঠিয়ালের যে কুঠিটা কিনে সারিয়ে তুলেছে গৌরগঞ্জের নেপাল রক্ষিত, সেই কুঠির চারিদিকেই তাকে দেখা যায় সন্ধ্যার সময়। দিনের বেলা খোঁজ মেলে না তার।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই পাগলটা, হঠাৎ দেখলে কাদের মিঞা ঢুকছে সেই কুঠিবাড়ীর ভিতর। সঙ্গে আরেকজন কে?

নেপাল রক্ষিত?—যাকে খুঁজছে সে এ কদিন ধরে, সেই পুত্রহন্তা, সেই··· ?

আড়ালে সরে দাঁড়াল পাগলটা। তারপর, কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে অন্ধকারে আত্মগোপন কোরে ধীরে ধীরে কান পাতলো কুঠিবাড়ীর একতলার ঘরের বন্ধ জানালাটায়।

আবছা শোনা যাচ্ছে ভেতরের কথাবার্তা।

: কি যে একটা মেয়ে জুটিয়ে আনলে মিঞা, সাত দিনেও তার চোখের জল শুকোল না। এখনও নাকি তার কোলের ছেলেটার জন্যে মন-কেমন করে।

নেপাল রক্ষিতেরই কণ্ঠস্বর বটে! বেশ চিনতে পারছে পাগলটা। এ-কণ্ঠস্বর যে পঞ্চাননের অনেক দিনের চেনা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গজ্‌রাতে লাগলো পঞ্চানন। কাঁপছে তার সমস্ত শরীর। পোড়া-ভিটের ছাই বুকে মেখে প্রতিজ্ঞা করেছে সে, নেপাল রক্ষিতের সমস্ত দুষ্কর্মের প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে!

: বাবা।

অন্ধকারের ভেতর থেকে এ কার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে পঞ্চাননের কানে? কে ডাকলে বাবা বলে? কে?

: আমি।

পঞ্চানন শিউরে উঠে পিছন ফিরেই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল!

তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হারাণের বৌ,—তার আদরের বৌমা!

এখনো বেঁচে আছে! এখনো বেঁচে আছে বৌমা! এর পরেও আত্মহত্যা করেনি সে! গলায় দড়ি দেয়নি? পুকুরের জলে ডুবে মরেনি?

হাতে একখানি প্রদীপ নিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে হারাণের বৌ। প্রদীপের আলো কাঁপছে তার মুখের ওপর।

পঞ্চাননের মনে হল ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের হাতে হত্যা করে সে এই কলঙ্কিনীকে। কিন্তু চেরাগের আলোয় যার মুখ দেখে কাদের মিঞার পক্ষেও সম্ভব হয় না নোংরা কথা উচ্চারণ করতে,—প্রদীপের আলোয় তার মুখখানা কী মহিমায় যে ভরে ওঠে,—পঞ্চানন স্তব্ধ হয়ে যায়।

ইসারায় ডাকে হারাণের বৌ: এদিকে সরে এস বাবা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করে পঞ্চানন।

কাকে অনুসরণ করছে পঞ্চানন? সে কি জীবিতা?—নাকি বৌমার ছায়ামূর্ত্তি? কী নিঃশব্দ তার পদক্ষেপ!

খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ায় ছায়ামূর্ত্তি।

: ছোঁব না তোমায় বাবা। এখান থেকেই নমস্কার নাও।

ছায়ামূর্ত্তি তো নয়।—কিন্তু ছায়ামূর্ত্তি যদি নয়, তাহলে হাউহাউ কার কাঁদছে না কেন? বুড়ো শ্বশুরকে সামনে দেখে বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠছে না কেন?

পঞ্চাননই বা কেন পারছে না কাঁদতে?

: প্রতিশোধ নেবে না বাবা?—

দাঁতে দাঁত চেপে বলে হারাণের বৌ।

: নেব মা।

: বেঁচে আছি শুধু তারি জন্যে। চাপাকণ্ঠে বলে হারাণের বৌ। তারপর বলে: কাল এইসময় এখানে আসতে পারবে বাবা?

: কেন?

: প্রতিশোধ নিতে হবে।

: কি কোরে?

: কাল তুমি এস বাবা। কাল বলবো। আজ আমি যাই।

কলঙ্কিনী পুত্রবধূর হাতের প্রদীপের আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে গিয়ে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। পঞ্চাননের সুমুখে এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বুকের ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে উঠলো এতদিনের সমস্ত জমানো কান্না। চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠতে লাগলো নিহত স্ত্রী-পুত্রদের মুখ। দুহাতে নিজের মুখ চেপে ধরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো পঞ্চানন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে।

১২ই কার্তিকের সন্ধ্যা। বাঈমহলে আজ সাড়া পড়ে গেছে। বাঈমহল আর খাসমহলের চাকর-বামুন দাসী-বাঁদী যে যেখানে আছে সবাইকে নতুন কাপড় আর দশটা কোরে টাকা বিলিয়েছে রতনবাঈ।

খাসমহলের পুরোনো ভৃত্য হরিপদর কাছ থেকে এইসব খবর শুনতে শুনতে সাজগোজ করছিল তখন দর্প কতদিন পর আবার খাস্‌মহলের প্রকাণ্ড আর্সিটার সামনে দাঁড়িয়ে। সাতটার ঘণ্টা বাজলেই বাঈমহলের নাচের আসরে যেতে হবে। নিচে বাঁধা আছে ঘোড়া। এমন সময় আয়নায় কার ছায়া পড়ে।

কে ?

চম্‌কে ফিরে দাঁড়ায় দর্প : কে আপনি ?

মাথার ওপর শুঁড়তোলা টেরি, পাকানো বেঁটে গোঁফ, গলায় পাকানো চাদর, হাতে বেলফুলের মালা। আগন্তুক হেসে বলে : আমি ? হুঁহুঁ চিনবেন ; একটু পরে।

আগন্তুক সটান্ ঘরের মধ্যে ঢুকে আসে। একটু দাঁড়িয়ে সহজ কণ্ঠে বলে : জানালাটা দিয়ে ফুর ফুর কোরে বেশ মিঠে হাওয়া আসছে তো। এইটাই বুঝি দক্ষিণ ?

দর্প কি স্বপ্ন দেখছে !—ভুবনপুরের রায়েদের ভেতরমহলে বাইরের একটা অচেনা উট্‌কো লোক এসে কথা বলছে! এই দশমাসে এত বদল হয়ে গেল ভুবনপুরের !

চীৎকার কোরে ওঠে দর্প : কে আপনি ? ওপরে উঠে এসেছেন কার হুকুমে ?—হরিপদ, হরিসিং কোথায় ?—হরিসিং !

মুচকি হাসে আগন্তুক : আস্তে। চেঁচিয়ে লাভ নেই। হরিসিং মানে আপনাদের দরোয়ান তো ? সে দেখেছে আমি এসেছি।

আগন্তুক পালংকের ওপর উঠে বসে।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দর্প : আপনি পালংকে বসছেন কোন্ সাহসে ?

: সাহস ?—আবার হাসে আগন্তুক : আরে মশাই এ-রায়-বাড়ীর সঙ্গে যে আমাদের তিন পুরুষের কুটুম্বিতে। চাক্ষুষ আলাপ নেই, তাই চিনতে পারছেন না।

পায়ের ওপর পা তুলে দেয় আগন্তুক। পানের ডিবে খুলে পান মুখে দেয় একটা। তারপর ডিবেটা দর্পর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে : হবে না কি একটা ?

দশমাস পরে এ কোন্ রায়বাড়ীতে এসে পৌঁছেছে দর্প, যেখানে অচেনা লোকেরও অন্দরে ঢোকবার অবাধ স্বাধীনতা !

চীৎকার কোরে ওঠে দর্প : বেরিয়ে যান।

অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে আগন্তুক ভৃত্য হরিপদর দিকে চেয়ে বলে : ঘর থেকে বাইরে যা তো ব্যাটা। তোদের বাবুর সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে। যাবার সময় দরোজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্ রে !

দর্প আর একবার চেঁচিয়ে ওঠে : বেরিয়ে যান।

চীৎকারটা নিজের কানেই কেমন যেন হাস্যকর মনে হয়। এই অচেনা-অজানা লোকটার সামনে নিজেকে কেমন যেন দুর্ব্বল মনে হয় দর্পর।

আগন্তুকের পকেট থেকে বিলিতি মদের বোতল বেরয়। গলায় খানিকটা ঢেলে আগন্তুক বলে : হবে নাকি ?

ঝাকুনি দেয় দর্প সজোরে : বেরিয়ে যাও।

আগন্তুক হেসে বলে : কিন্তু আমার গোপনীয় কথাটা ?

*   *   *

ওদিকে বাঈমহলের ঝুল-বারান্দায় সেই সন্ধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে আছে রত্তনবাঈ। অঙ্গে পরেছে আজ উৎসবের সাজ। হাতে টাট্‌কা যুঁই ফুলের মালা। ওড়নার আবছায়া থেকেও চিক্‌চিক্ করছে রতনবাঈ-এর নাকের হীরের নথটা।

ঘণ্টাফটকে সন্ধ্যে সাতটার ঘণ্টা বাজলো। কিন্তু কৈ ? এখনো এলো না তো কেউ ?

আরো সময় যায়। ছটফট করে রতনবাঈ। আকাশের একটি তারাকে সেই সন্ধ্যার সুরুতেই ফুটে উঠতে দেখেছে রতনবাঈ। সেই একই জায়গায় সে এখনো দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। কিন্তু রতনবাঈ আর পারে না যে !

ঢং ঢং করে আটটা বাজে ঘণ্টাফটকের ঘণ্টায়। আটটা ? সাত্য আটটা ? ভুল করেনি তো রতনবাঈ গুণতে ? সাতটার ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই আজ যে তার আসবার কথা !

বুড়ো নিতাই এসে ঢোকে বারান্দায় : দিদি রাত আটটা হল।

: শুনেছি।

বুড়ো নিতাই বলে : নাচঘরে অপেক্ষা করছেন সবাই তোমার জন্যে।

জানে রত্না। খুব ভাল করেই জানে, আজকের মজলিসে এসেছেন কতো গুণীজন। মালিকান-এর হাজিরা না পেলে সেখানে সুরু হতে পারছে না আসর। কিন্তু—

আবার বলে নিতাই : অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন সবাই।

এবার যেন কান্নার মত শোনায় রতনবাঈ-এর কণ্ঠ : সবায়ের অপেক্ষাটাই শুধু তুই দেখছিস্ নিতাইদা ; আর আমি অপেক্ষা করছি না ?

নিতাই বলে : শুনলুম, কে এক অচেনা লোক এসে উঠেছেন ছোটবাবুর খাস কামরায়। দরজা বন্ধ করে তাঁর সঙ্গে কি যেন কাজের কথা···

: কাজ !—

আহতা সর্পিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়ায় যেন রতনবাঈ।

বাঈমহলে আসার চেয়েও আর কোন দরকারী কাজ থাকতে পারে নাকি আজকেও ?—কি ? কি সে এমন দরকারী কাজ, যা ঘণ্টা-ফটকের সাতটার ঘণ্টা শোনবার পরেও বন্ধ হয় না ? কী সে এমন দরকারী কথা, যা ১২ই কার্ত্তিকের কথাও ভুলিয়ে দেয় ?

যে মানুষটা এক দিন রত্নাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল সব কিছু ছেড়ে,—এ কি সেই মানুষ ? রত্নার কেবলি মনে হয়, দশ মাস বাদে আর একটা নতুন মানুষ এসে যেন ঢুকেছে খাসমহলে।

নিতাই আবার মনে করিয়ে দেয় : কিন্তু নাচঘরে সবাই যে···

: বলে দে হবে না, হবে না ; কিছু হবে না আজ। চলে যেতে বলে দে সবাইকে।

: কিন্তু—

: না, না, না। আর্ত্তনাদ করে ওঠে রতনবাঈ : কাউকে থাকতে হবে না, কাউকে থাকতে হবে না আজ বাঈমহলে। নিবিয়ে

দে, নিবিয়ে দে সব আলো। তবু দাঁড়িয়ে রইলি ?—যা যা যা তুই এখান থেকে।

নিতাই চলে যায়।

পরক্ষণেই চীৎকার করে ওঠে রতনবাঈ : না, না। যেতে হবে না কাউকে। জ্বেলে দে স-ব আলো নাচঘরের। নিয়ে আয় আমার পাঁয়জোড়, বাজাতে বল্ সারেঙ্গী। পাঁয়জোড় আর সারেঙ্গীর শব্দ কোন ১২ই কার্ত্তিক বন্ধ থাকেনি বাঈমহলে। আজও বন্ধ থাকবে না। কারুর জন্যেই নয়।

*　　　　*　　　　*

আরো অনেক রাত্রে সেই অচেনা মানুষটি বেরিয়ে যায় [illegible] কামরা থেকে।

যেন কোন্ শয়তান যাদুকর তার যাদুদণ্ডের স্পর্শে এক লহমায় দর্পর সমস্ত চেহারাটাকেই বদ্‌লে দিয়ে যায়। মুখের সমস্ত রক্ত যেন নিঙড়ে নিয়ে যায়।

দর্পর মনে হয়, ঘরের দেয়ালগুলো যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, ঘরটি যেন ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে,—আর সেই ঘরের মাঝখানে দর্প যেন ক্রমেই ছোট হতে হতে বিন্দুর মতো হয়ে আসছে! তারপর? —নেই, নেই, দর্প নেই কোথাও ;—শূন্য ঘর। সেই শূন্যঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হা-হা করে হাসছে ঐ আগন্তুক। লিকলিকে তার দেহ। মাথায় কোঁচকানো শক্ত চুল। রোগা গাঁটওয়ালা গলা। নাম তার নেপাল রক্ষিত। বাপের নাম কেশব রক্ষিত। নিবাস গৌরগঞ্জ।

ভুবনপুর থেকে গৌরগঞ্জ আটক্রোশ পথ। তিনপুরুষ ধোরে

এই পথ দিয়ে ভুবনপুরের রায়বাড়ীর দলিল-পাটা চলে গেছে রক্ষিতদের লোহার সিন্দুকে। রায়েদের সিন্দুক আজ নিঃশেষ ;— রক্ষিতদের একটা সিন্দুকে আজ কুলোচ্ছে না !

দর্প তাকায় খাস্‌মহলের বৈঠকখানার চারিদিকে। দেয়ালের গায়ে গায়ে কাট্‌-গ্লাসের ঝাড়লণ্ঠন,—এতটুকু ময়লার দাগ নেই তাতে। কড়ি-বরগার তু'ধারে গিল্‌টির কাজ করা নক্সা,—বিবর্ণ হয়নি কোথাও। মস্ত টানা-পাখায় সাঁচ্চা জরির ঝালর,—মলিন হয়নি এতটুকু। বড় বড় শ্বেতপাথরের মেঝে, ঔজ্জ্বল্য তার ক্ষুণ্ণ হয়নি একতিল। মালক্ষ্মী কিন্তু কোন্ ফাঁকে আটক্রোশ পথ পেরিয়ে গৌরগঞ্জের রক্ষিতদের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন !

গজভুক্তকপিত্থবৎ......... ।

দর্পর হঠাৎ কেমন হাসতে ইচ্ছে করে। প্রাণখোলা অট্টহাসি। যে হাসিতে কেঁপে উঠবে ঝাড়লণ্ঠনের রঙিন্ কলম্‌গুলো, যে হাসিতে নড়ে উঠবে পূর্ব্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং-এর পুরোনো দড়িগুলো। কিন্তু তার আগেই ঘণ্টাফটক তার ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। ঢং ঢং ঢং ঢং ......রাত নটা।

মনে পড়ে যায় হঠাৎ রত্নার কথা। মনে পড়ে যায়, আজ ১২ই কার্ত্তিক। মনে পড়ে যায়, রত্না অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। প্রতীক্ষমানা রত্নার করুণ মুখখানি ভেসে ওঠে দর্পর চোখের সামনে। দর্প ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

বাঈমহলের দরোয়ান ভুখন্‌সিং সেলাম ঠুকে সিধে হয়ে দাঁড়ায় ঃ হুজৌর।

: মাইজী কোথায় ?

: উপর।

দর্প সিঁড়ি দিয়ে বাঈমহলের ওপরে ওঠে।

কিন্তু এ কার গলা ভেসে আসছে ওপর থেকে ? রতনবাঈ-এর ? —কি গান গাইছে ? 'পানি ভরেরি কোন্ আলবেলে কিনারে ছমাছম্ ?'

ওঃ ! তাহলে দর্পর অনুপস্থিতিতে আজকের মজলিসের কোন অভাবই ঘটেনি। কোথাও ছন্দ-পতন হয়নি এতটুকু ? কোথাও সুর কাটেনি এক তিল ! চমৎকার ! চমৎকার মেয়েদের মন ! দশমাসে এতখানি বদলে যেতে মেয়েরাই পারে !

দর্প সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে টলতে টলতে।

বাঈমহলের দরোয়ান্ ভুখনসিং আবার সেলাম ঠুকে দাঁড়ায় : হুজৌর ?

রুমালে বাঁধা মোহর কটা তার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে দর্প বলে : বলিস্, আমি এসেছিলুম। ফিরে গেছি।

আবার এসে বসে দর্প খাস্মহলের কাম্রায়। মনে হয়, সে যেন কোন্ বিদেশের এক মুসাফিরখানায় ঠাঁই নিয়েছে ; কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বেরিয়ে পড়তে হবে।

হ্যাঁ। বেরিয়েই তো পড়তে হবে দর্পকে। ভুবনপুরের খাস্মহলে তো ঠাঁই হল না দর্পনারায়ণের। কাছারিবাড়ীর চার পুরুষের সেই জাজিমপাতা গদিতে মখমলের উঁচু তাকিয়ায় ঠেস্ দেওয়া হল না তার। টানা হল না রুপো-বাঁধানো লক্ষ্ণৌয়ের আল্বোলায় গাজীপুরী

তামাকের ধোঁয়া। আজ সন্ধ্যায় গৌরগঞ্জের নেপাল রক্ষিত এসে এক লহমায় সব কেড়ে নিয়ে ফতুর কোরে দিয়ে গেল দর্পনারায়ণকে।

অনেক কথাই জানিয়ে গেছে সে আজ। পরিষ্কার কোরে জানিয়ে গেছে ভুবনপুরের রায়েদের আসল অবস্থাটা।

নাগরির গুড় খালি হয়ে আসছিল অনেক দিন থেকেই। রায়বংশের চতুর্থ পুরুষ অনন্তনারায়ণের আমলে গুড় চাঁচতে গিয়ে নাগরির মাটিই উঠে এসেছিল বেশি। দর্পনারায়ণের জন্তে সেটুকুও রইল না আর।

জমি-জমা খাস্-তালুক যেতে সুরু করেছিল অনেক দিন আগেই,—তবু ছিটে ফোঁটা যা ছিল, রয়ে সয়ে খরচ করলে তাতেও আরো দু-এক পুরুষ হয়তো চলতো। কিন্তু অনন্তনারায়ণ রায়বংশের ইজ্জৎ ঢিলে হতে দেননি কিছুতেই। পুরোণো আমলের খাতা খুলে যে-খাতে যত টাকা খরচের হিসেব ছিল, সব বজায় রেখেছেন কড়া-ক্রান্তিতে। তাই, রায়েদের সবকিছুই আজ বাঁধা পড়ে গেছে রক্ষিতদের সিন্ধুকে।

গৌরগঞ্জের নেপাল রক্ষিত আজ ভুবনপুরের খাস্‌মহলের অন্দরে ঢুকে দু-বোতল মদে গলা ভিজিয়ে দর্পকে জানিয়ে গেছে সমস্ত কথা। আরো জানিয়ে গেছে,—সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সে দখল নিতে চায়।

নিক্। সব নিক্। চলে যাবে দর্প সব কিছুর মায়া ত্যাগ কোরে। আজ রাত্রে জীবনটা তার কাছে তিক্ত হয়ে উঠেছে, বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। এতটুকু মায়া আজ আর নেই।

সপ্তাহখানেক বাদে কেন? আজ এই মুহূর্তেই সবকিছু ছেড়ে

চলে যাবে দর্প একা। কিন্তু যাবে কোথায়? সংসারে কোথায় ঠাঁই আছে মাথা গোঁজবার?

ঢং ঢং করে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজে রায়েদের ঘণ্টাফটকে—ভুবনপুরের সদর-সড়কের চৌমাথায় বিরাট প্রহরীর মতো যে দাঁড়িয়ে আছে একা, সে যেন ডাক দেয় দর্পকে তার ঘণ্টা নেড়ে। বলে যেন—'এই তো আমি আছি।'

আছে। সত্যি আছে। দেনার দায় থেকে বেঁচে গেছে ঐ ঘণ্টাফটক। ওরই ওপর আছে লম্বা ঘর। বৃন্দাবন ঘণ্টাদার বাস করে সেখানে। ঐখানেই যাবে দর্প। এ ভালই হল। রায়েদের আভিজাত্য, রায়েদের বংশমর্য্যাদার প্রতীক ঐ ঘণ্টাফটকেই তবু স্থান হল দর্পনারায়ণের।

তারপর?—তারপর একদিন নেপাল রক্ষিতকে দখল দিয়ে কোথাও চলে যাবে দর্প।

কোথায়?—জানে না সে।

জানে শুধু— কোথাও।

দর্প উঠে গিয়ে দাঁড়ায় জানালায়। রাতের অন্ধকারেও দেখা যায় রায়েদের ঘণ্টাফটক তার উঁচু মাথাটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে।

বৃন্দাবন ঘন্টাদার এতদিন একাই থাকতো ঘন্টাফটকের ঐ লম্বা খিলেন-ওয়ালা ঘরটায়। সময় মতো লোহার শেকল ঘুরিয়ে ঘণ্টা বাজানোই তার কাজ। স্বয়ং ভুবনপুরের ছোটবাবুই যে কোনদিন তার ঘরে মাথা গুঁজতে আসতে পারেন, একথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

বিছুরের ঘরে যেন নারায়ণ এসেছেন ছুটি ক্ষুদ মুখে দিয়ে তৃপ্ত হ'তে।

কিছুই সঙ্গে আনেনি দর্পনারায়ণ। শুধু সেই মেহগ্নির কাজ-করা বড় পালঙ্কটা। তাতে না শুলে ঘুম আসে না যে। আর এনেছে বড় বন্দুকটা। বন্দুকটা ভারী প্রিয়। আর এনেছে আটটি অয়েল-পেন্টিং ;—রায়েদের চারপুরুষের চারজোড়া প্রোট্রেট্।

ভুবনপুরের রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী রাণী মহামায়া দেবীর পোট্রেটের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। দুর্লভ সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। তিনি এ-সংসারে আসবার পর থেকেই তো রায়েদের বাড়-বাড়ন্ত যা-কিছু।

চলে যাবে দর্প ভুবনপুর ছেড়ে। শুধু লেখাপড়া দলিল-দস্তাবেজে দস্তখৎ কোরে নেপালকে ভুবনপুরের সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার জন্যে যে ক'দিন না থাকলেই নয়, সেই ক'দিন থাকবে এখানে।

ঘন্টাফটকের ঘরের দেয়ালে বড় বড় অয়েল-পেন্টিংগুলো টাঙিয়ে দিয়ে ফটকের ছাদের পাঁচিলে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দর্প চুপ্‌চাপ্।

অদূরেই দেখা যাচ্ছে খাস্‌মহল। হেমন্তের অস্পষ্ট অপরাহ্ণ। এরি মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে পড়ন্ত রোদ। কেমন শীত শীত করতে সুরু করেছে। এমন দূর থেকে একা দাঁড়িয়ে দেখেনি তো দর্প কোনদিন খাসমহলকে। বিদেশী পরিদর্শকের মত দর্প যেন আজ এসে দাঁড়িয়েছে ঘণ্টাফটকের ওপরে। ওর ভিতরকার সেই পুরোনো দর্পটা যেন এই আগন্তুক পরিদর্শককে ডেকে দেখাতে থাকে : ঐ ত্থাখো পূব্‌-ঘর। ঐ ঘরে থাকতেন রাণী হৈমবতী। —ঐ ত্থাখো কাঁচঘর। অনন্তনারায়ণ সকালে উঠে বীণ্‌ বাজাতেন ঐ ঘরে বোসে।—ঐ যে দেখা যাচ্ছে ছাদের মাঝে পাথরের জাফ্‌রি দেওয়া গোল-ঘর ;—দুপুরে চুল শুকোতেন রাণী হৈমবতী ঐ ঘরে। আর ঐ যে দেখছো দক্ষিণের বারান্দার ধারে একটা ঘরের একটুখানি দেখা যাচ্ছে,—ঐখানে তারিণী পণ্ডিতের কাছে মানসাঙ্ক শিখতো দর্প বোলে একটি ছোট্ট ছেলে।—আর ঐ যে দেখছো খাস্‌মহল থেকে বেরিয়ে অষ্টভূজার মন্দিরের পাশ দিয়ে ঘুরে একটা পথ চলে গেছে পশ্চিম দিকে,—খাস্‌মহলের ঘোড়া চারপুরুষ ধোরে ঐ পথে তাদের রাজাদের পৌঁছে দিয়েছে বাঈমহলে!

এই ঘণ্টাফটকের ঘণ্টায় ঢং ঢং কোরে সাতটা বাজলেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে রায়েদের আস্তাবলের ঘোড়া তার রাজাকে পিঠে নিয়ে ঐ পথ দিয়ে ছুটে চলবার জন্যে। আবার রাত দশটার ঘণ্টা শুনে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে ঘোড়া ঐ পথেই তার রাজাকে।

ঘণ্টাফটকের ঘণ্টায় আরো কতবার সাতটা বাজবে। কিন্তু ও-পথে আর উঠবে না অশ্বক্ষুরধ্বনি!

দর্প বাঈমহলের দিকে তাকায়। হেমন্তের সূর্য্য ঢলে পড়েছে গাছের আড়ালে। একফালি রোদ এসে পড়েছে শুধু বাঈমহলের গায়ে।

নেপাল রক্ষিতের কাছে সবকিছুই বাঁধা পড়েছে রায়েদের, শুধু এই ঘণ্টাফটকটি বাদে। আর বাঁধা পড়েনি বাঈমহল। পড়েনি, ওটা রায়েদের নয় বোলেই।

বাঈমহলের সম্পত্তিতে বাঈ-এদেরই শুধু অধিকার। এ-ব্যবস্থা কোরে গেছলেন স্বর্গীয় অনন্তনারায়ণের পিতা ৺রণেন্দ্রনারায়ণ রায়। জৌর্দ্দনবাঈ তখন মালিকান্। বাঈমহলের খাতায়-কাগজে সই দিয়েছেন জৌর্দ্দনবাঈ, দিয়েছেন পিয়ারাবাঈ, দিচ্ছে রতনবাঈ জয়পুরী।

রতনবাঈ।

চোখটা কেমন ঝাপ্সা হয়ে আসে দর্পর। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

হেমন্তের শেষ আলো ঢলে গেছে গাছের আড়ালে। আকাশের বুকে ফুটে উঠতে সুরু করেছে একটি দুটি তারা এখানে-ওখানে। ঠিক দর্পর মাথার ওপরেই দুটি তারা, পাশাপাশি।

দর্পর মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার কথা। মাকে হারিয়ে দর্প যখন কাঁদছিল, ছোট্ট রত্না বলেছিল : ঐ যে দুটো তারা, —তোমার মা আর আমার মা।

মা গো, সত্যি আছো তুমি ঐ তারার মধ্যে?

বৃন্দাবন ঘণ্টাদার পিছনে এসে দাঁড়ায় : ছোটহুজুর, দুধ এনেছি।

বাঈমহলের ঝুল-বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে ছিল রতনবাঈ,—বুড়ো নিতাই এসে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাক দিলে : দিদি।

রতনবাঈ ফিরে দাঁড়ালো। নিতাইদাকে জামা গায়ে দিতে দেখেনি কোনদিন রতনবাঈ জীবনে। কালো কোর্ত্তায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে মানুষটাকে। কোমরে একটা চাদর বাঁধা।

নিতাই বলে : তাহলে আসি দিদি।

: চললি নিতাই দা।

বুড়ো নিতাই সত্যই চললো। যাবার অনুমতি যখন চেয়েছিল রত্নার কাছে, তখন কি রত্না ভাবতে পেরেছিল যে, ঠিক এতখানি কষ্ট হবে তার নিতাইদাকে ছেড়ে দিতে? পারেনি। পারলে সে নিশ্চয়ই বলতো : হবে না, হবে না,—উঁহু, তোর কোথাও যাওয়া হবে না নিতাইদা।

রত্না বলে : হ্যাঁরে, খাস্‌মহলের নায়েবমশাই, গঙ্গাপ্রসাদ সরকার মশাই, এঁরা?

: ওঁরা গেছেন ঘণ্টাফটকে। ছোটবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিতে।

বিদায় নেওয়া হয়ে গেলে চলে যাবেন সবাই ভুবনপুর ছেড়ে। এক এক কোরে অনেকেই চলে যাচ্ছে। রত্নাও ভেবেছিল, চলে যাবে বৃন্দাবনে, পিসিমার কাছে; সঙ্গে নিয়ে যাবে বুড়ো নিতাইকে। তীর্থ করবার ওর বড় সাধ। কিন্তু যাবে কি কোরে রত্না? যতক্ষণ দর্প আছে ঘণ্টাফটকে, ততদিন ভুবনপুর ছেড়ে যাবে কোথায় রতন-বাঈ? যাবার কি তার জো আছে?

রত্না বলে : তুইও কি আর ফিরবি না নিতাইদা ?

বুড়ো নিতাই ঠিক কোরে এসেছিল, কিছুতেই কাঁদবে না সে রতনদিদির সুমুখে। এ আর শক্ত কি এমন।—কিন্তু রত্ন-দিদি যে জোর কোরে কাঁদালে। বলে কিনা, নিতাই ফিরবে না আর ? তাকে ছেড়ে নিতাই বুড়ো থাকবে কোন্ চুলোয় ?

বুড়োর চোখের জলে বুক ভাসে : আমি ফিরবো না কেন দিদি, —আমার যে সব রইল এখানে ! অনেকদিন দেশে-ঘরে যাইনি,— ওনারা সব যাচ্ছেন,—তাই ক'দিনের জন্যে···

আর বলতে পারে না।

রত্না গলা থেকে নিজের মুক্তোর মালাছড়া খুলে দেয় : এই নে নিতাইদা।

: কেন দিদি ?

: তোর নাত্নিকে দিস্। বলিস তার রতনদিদি দিয়েছে।

উত্তর দেয় না নিতাই। কথা বলতে গেলেই কান্না বেরিয়ে আসবে। ঘাড় নেড়ে বিদায় নেয়।

রত্না বলে : যাবার সময় ঘণ্টাকটকটা একবার হয়ে যাবি না নিতাইদা ?

ফিরে দাঁড়ায় নিতাই : যাব। নিশ্চয়ই যাব।

তারপর চাপাকণ্ঠে বলে : এ সময়ে তুমিও একবার গেলে পারতে দিদি।

: কিন্তু রাগ কোরে ঘণ্টাকটকে চলে যাবার আগে ওরই কি উচিত ছিল না আমাকে বলে যাওয়া ?

: ওঁর মনের অবস্থাটার কথা ভাব দিদি।

: রোজ দু-বেলা নিজে হাতে রেঁধে থালা সাজিয়ে খাবার পাঠাই ওর ঘণ্টাফটকে। কিন্তু কৈ, বৃন্দাবন ঘণ্টাদারকে তো একবারও জিজ্ঞেস করেনি, রত্না কেমন আছে?

: উনি জানেন বৃন্দাবনই রেঁধেছে খাবার। তুমি পাঠাও, জানবেন কেমন করে? বৃন্দাবনকে সে-কথা বলতে তো তুমিই বারণ করেছ দিদি।

স্নেহ ঝরে পড়ে নিতাই বুড়োর কম্পিতকণ্ঠে।

কিন্তু করলেই বা বারণ। খবরের স্বাদ-বর্ণ দেখেও কি বুঝতে পারে না দর্প,—এ-রান্না কার? সংসারে আর কে আছে ওব এই রতনবাঈ ছাড়া, যে ওকে এত যত্ন কোরে রেঁধে খাওয়াবে?

রত্না বলে: বুঝতে ও সব পারে নিতাইদা, বুঝতে ও সবই পারে। বুঝতে চায় না। ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না।

বুড়ো নিতাই চলে গেছে অনেকক্ষণ। কেমন উন্মনা হয়ে বসে ছিল রত্না চুপচাপ, ঝুল-বারান্দায়। ঘণ্টাফটকে সন্ধ্যা সাতটার ঘণ্টা বাজতেই অভ্যাস মতো এগিয়ে গেল নাচঘরের দিকে। একটু বীণ্‌ বাজাবে একা বোসে।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালো রত্না। এ কী!—নাচমহলের সামনের ধবধবে শ্বেতপাথরের লম্বা দালানে জুতোর দাগ!

সেই রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত নাচঘরের মেঝেয় জুতোর দাগ পড়েনি কোনদিন। নাচঘরের দালানে ওঠবার আগে বাইরে জুতো-জোড়া খুলে রাখাই এখানকার কানুন। —এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটলো।

রতনবাঈ সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে একজোড়া জুতোর দাগ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালান মাড়িয়ে সোজা ঢুকে গেছে নাচঘরের ভেতর।

এগিয়ে গেল রতনবাঈ নাচঘরের ভেতর। পার্সিয়ান কার্পেটের ওপর একজোড়া পাম্প্‌ সু পায়ে দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে পাথরের একটি নারীমূর্ত্তির সামনে!

রম্ভা জেগে আছে তো?

দৃশ্যটা চোখের পথ বেয়ে রম্ভার অনুভূতিতে পৌঁছতে সময় লাগে অনেকক্ষণ। তারপর—

তীক্ষ্ণকণ্ঠে রতনবাঈ চিৎকার করে উঠলো: অর্জ্জুন সিং।

তারপর গলাব স্বর কিছুটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো: কে আপনি?

: আমি?—হাসলো লোকটা।

ততক্ষণে অর্জ্জুন সিং এসে দাঁড়িয়েছে রতনবাঈএর সামনে। নতুন লোক। ছুটি নিয়ে দেশে যাবার সময় ভুখন্ সিং বদ্‌লি দিয়ে গেছে।

: এই বেআদপটা কি কোরে এখানে এল? ঘুমোচ্ছিলি তোরা?—রাগে কাঁপছে তখন রতনবাঈ।

: পরিচয় দিলে বেআদপকে বোধ হয় তোমার ভালই লাগবে সুন্দরী।—বাঁকা হেসে জবাব দেয় লোকটি।

: অর্জ্জুন সিং!—ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতো গর্জ্জন কোরে ওঠে রতনবাঈ। তারপর দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করে।

অর্জ্জুন সিং জানে লোকটির পরিচয়। আর জানে বলেই তো বাধা দেয়নি তার প্রবেশ-পথে। অর্জ্জুন সিং জানে, ভুবনপুরের নতুন

জমিদারকে খুশী করতে পারলে আখেরে উন্নতি আছে। লোকটি নেপাল রক্ষিত।

কিন্তু রতনবাঈ অমন চেঁচামেচি করে চলে গেল কেন, কিছুতেই বুঝতে পারে না নেপাল রক্ষিত। আমোদ করতে কত জায়গাতেই তো গেছে নেপাল। এমনটা তো দেখেনি!

নেপাল রক্ষিত অর্জ্জুন সিংকে শুধোয়ঃ তোদের মাইজী অমন গোঁসা করলেন কেন রে?

অর্জ্জুন সিংও কারণটা আন্দাজ করতে পারে না কিছু।—নাচঘরে মানুষ এল,—তাতে রাগের কী? আর মানুষও যে সে নয়,—ভুবনপুরের নতুন মালিক,—পয়সার লেখা-জোখা নেই।

এই মেয়েমানুষ জাতটাকে আজো চিনতে পারে না কিছুতেই অর্জ্জুন সিং। ওরা যেন কেমন ধারা।

এই তো অর্জ্জুন সিং-এরই মেয়ে কান্তা। গোরখ্‌পুর পল্টনের হাবিলদার নিজে যেচে বলেছিল তাকে বিয়ে করবে। একটু বয়েস বেশি। একটু না হয় নেশা-ভাঙ করে। আগে আরো দুটো বিয়েই না হয় করেছিল। কিন্তু বেঁচে তো ছিল না বৌ-দুটো। বিয়ে হলে হাবিলদারের বৌ হতে পারতো কান্তা। কত টাকার গয়না উঠতো গায়ে।

তবু কিনা কান্তা পালিয়ে গেল সেই ছোটবেলার খেলার সাথী ইন্দিরনাথের সঙ্গেই। যার না আছে চাল না আছে চুলো। থাকবার মধ্যে আছে একটা বাঁশী। আর মিষ্টি স্বভাবটুকু।...

নেপাল-মহারাজের ওপর কেন যে গোঁসা করলেন মাইজী, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না বেচারা।

হঠাৎ চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে অর্জ্জুন সিং-এর। কারণ একটা সে পেয়েছে খুঁজে। তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাবার সময় ভুখন সিং বলেছিস: খবরদার, ভুলেও কোনদিন জুতো পরে উঠিসনি যেন ওপরে। গর্দ্দান যাবে তাহলে।

অর্জ্জুন বুঝিয়ে দেয় নেপালকে,—মাইজীর গোঁসার জন্যে নেপালের পায়ের ঐ জুতোজোড়াই দায়ী। এখানে জুতো পরে ঢোকা বে-কানুন।

হাসে নেপাল রক্ষিত: ওঃ, তোদের নাচঘরে শুদ্ধাচারে নগ্নপদে ঢুকতে হয় বুঝি? রায়-মহারাজেরা এখানে তসর-কাপড় পরে আসতেন নাকি?—আচ্ছা, তোর মাইজীকে বলিস, আমার নাম নেপাল রক্ষিত; কাল আবার আমি আসবো।

ঢং-ঢং ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং!

সন্ধ্যে সাতটার ঘণ্টা বাজালো বৃন্দাবন ঘণ্টাদার।

ঘণ্টাফটকের ওপরকার ঘরে মেহগ্‌নির পালঙ্কে শুয়ে দর্পনারায়ণ ডাকলো: বেন্দা।

: আজ্ঞে যাই হুজুর।

: কি করছিস রে ওধারে?

একটা খিলেনের আড়ালে খানিকটা জায়গা দরমা দিয়ে ঘিরে নিয়ে রান্নাঘর করেছে বৃন্দাবন। ঘণ্টা বাজানো শেষ কোরে তারই ভেতরে ঢুকেছিল সে। বললে: এই আপনার দুধটা কোটাচ্ছি আজ্ঞে।

: চাই না দুধ। তুই এদিকে আয়।

বৃন্দাবন ভয়ে ভয়ে দাঁড়ায় পালঙ্কের ধারে। দর্পনারায়ণ বলে : আলোটাকে আর একটু কমিয়ে দিয়ে বোস্ দিকিনি এখানে। আহা, মাটির ওপরে পিঁড়িটা পেতেই না হয় বোস।

আলোটা কমিয়ে দেয় বৃন্দাবন। ঘন্টাফটকের গায়ের পুরোণো ফাটলগুলো আরো যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠে। মনে হয়, অন্ধকার হতেই যেন ফাটলের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়েছে সরীসৃপগুলো।

বৃন্দাবন আড়ষ্ট হয়ে বসে পিঁড়ির ওপর।

দর্প বলে : আয় গল্প করি। একা একা ভাল লাগছে না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা নেপাল রক্ষিত আবার এল।

অর্জ্জুন সিং বললে : হুজুর, মাইজী মানা করে দিয়েছেন।

: তাই নাকি ? কিন্তু কিছু ভয় নেই তোর। আজ আর তোদের মাইজী রাগ করবে না একটুও। এই নে।

বেশ কয়েকটা টাকা অর্জ্জুন সিং-এর হাতে গুঁজে দিয়ে তর্‌তর্ কোরে নেপাল রক্ষিত উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নাচঘরের দালানের কাছে এসে কি ভেবে জুতোটা রাখলে খুলে। তারপর সটান ঢুকে গেল নাচঘরে।

সম্পূর্ণ একা বীণ্ নিয়ে বসেছিল রতনবাঈ। অস্ফুট একটা করুণ সুর উঠছিল বীণের তারে এবং তার মধুর কণ্ঠে। গৌরগঞ্জের তেজারতি কারবারী কেশব রক্ষিতের ছেলে নেপাল রক্ষিত নিতান্তই বেরসিকের মতো বেজায়গায় বাহবা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো : বলিহারী।

নেপাল রক্ষিতের বেসুরো কণ্ঠের কর্কশ স্বরে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো

যেন নাচঘরের প্রত্যেকটি আলোর ঝাড়ের কলমগুলো। ওরা যেন জ্র কুঁচকে বলে উঠলো,—কে এই বেআদপ বেরসিক্ ?

গান থেমে গেল। চকিতে বীণ্ ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো গর্জ্জে উঠলো রতনবাঈ : আবার কেন এসেছেন আপনি ?

: শঙ্করাচার্য্যের মোহদগমুর শোনবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই প্রিয়ে।

: অর্জ্জুন সিং।

: সে এইমাত্র কুড়ি টাকা বক্‌শিস্ পেয়েছে আমার কাছে। আর তোমার জন্যে—

একটু হেঁট হয়ে পকেট থেকে একটা গহনার বাক্স বের কোরে খুলে ধরে নেপাল। নেকলেসের উজ্জ্বল পাথরগুলো চক্‌চক্ কোরে ওঠে।

: বেরিয়ে যান। যান বলছি।

: কেন ? তোমাদের শ্বেতপাথরের মেঝেয় আজ তো আমি জুতোর দাগ ফেলিনি সুন্দরী।

: বেরিয়ে যান।

: তবু বেরিয়ে যেতে হবে ? এটা কিন্তু অবিচার হচ্ছে না সুন্দরী ?

: আপনি যাবেন কি না ?

: রায়-মহারাজেরা কত দিত তোমাদের এক সন্ধ্যের খরচ ? তার ডবল পাবে।

: অর্জ্জুন সিং।

: জানো বোধহয়, আমারই নাম নেপাল রক্ষিত ?

: জানি।

: জানো বোধ হয়, ভুবনপুরের রায়েদের সব কিছুই এখন আমার ?

: জানি। আর এও বোধহয় আপনার জানা আছে যে বাঈমহলের সম্পত্তি রায়েদের জমিদারীর বাইরে ?

: হ্যাঁ। জানি বৈকি। দেবত্তর সম্পত্তির মতো এটা যে বাঈজীত্তর সম্পত্তি, তা জানি। কিন্তু খাস্‌মহলের কর্ত্তারাই তো পুরুষানুক্রমে এই নাচমহলের একমাত্র অতিথি হয়ে এসেছেন,—তাই না ? তা' খাস্‌মহলের বর্ত্তমান কর্ত্তা নেপাল রক্ষিত কি এমন অপরাধ করলে প্রিয়ে ?

একটু একটু কোরে এগিয়ে আসে নেপাল রক্ষিত।

: এগিয়ে আসবেন না আপনি।

হাসে নেপাল : ঐ তো আমার দোষ প্রিয়ে, এগোনো ছাড়া পেছুতে কখনো শিখিনি। আজ আর নতুন করে পেছুব কি করে ?

পাথরের ছোট ফুলদানীটা আচম্‌কা সজোরে এসে লাগে নেপাল রক্ষিতের কপালে। কপাল কেটে রক্ত পড়ে গড়িয়ে। ক্ষতস্থানে রুমাল মুঠো কোরে চেপে ধরে বেরিয়ে যায় নেপাল। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বলে যায় : কাল রাত্রে দেখা হবে ফের। আসল নেপাল রক্ষিতকে কাল দেখতে পাবে। তৈরী হয়ে থেকো।

পরদিন সকাল থেকে সুরু হয়েছে ঝড় আর বৃষ্টি। এমন অসময়ে কার্ত্তিক মাসের শেষে এমন ঝড় দেখেনি কেউ ভুবনপুরে। নব্বই বছরের নরহরি কবিরাজের কেবল অস্পষ্ট মনে পড়ে, তিনি যখন আট বছরেরটি, তখন একবার এমনি ঝড় হয়েছিল জগদ্ধাত্রী পুজোর আগের দিন! তার পরে এই দীর্ঘ বিরাশী বছরে আর কখনো কার্ত্তিক মাসের শেষে এমন ঝড়-জল দেখেননি তিনি।

একটা দৈত্য যেন কোন্ রুদ্ধ আক্রোশে ভুবনপুরটাকে তছ্‌নছ্‌ কোরে দিতে চায়।

বৃষ্টিটা থেমে গেল বিকেলের মধ্যেই, কিন্তু ঝড় থামলো না। শোঁ শোঁ কোরে ছুটে ছুটে এসে ধাক্কা মারতে লাগল ঘন্টাফটকের গায়ে।

এই ঝড়ে বৃন্দাবন ঘন্টাদার যে কোথায় গেল নেমে কে জানে। দর্প একা চুপচাপ শুয়ে ছিল মেহগনির পালঙ্কে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে ছিল সেই সকাল থেকেই। এখন আরো বেড়েছে। আলো জ্বালবার উপায় নেই ;—ঝড়ে কেবলি নিভে যাচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ঘন্টাফটকের ওপর।

দর্পর হঠাৎ মনে হল, সেই ঝড়ের হাওয়ায় অন্ধকারে কি একটা ভারী বস্তু যেন উড়ে এসে পড়লো তার পালঙ্কের শিয়রে।

: কে ?—চম্‌কে উঠলো দর্প।

: চুপ। আমি।

দর্প চেয়ে দেখলে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মনুষ্যাকৃতি একটি প্রাণী। সে যেন মূর্ত্তিমান ঝড়! একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি,

এক মাথা জটার মত চুল, কোটরগত দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। শতচ্ছিন্ন দুর্গন্ধময় একটা কাঁথা গায়ে জড়ানো।

দর্প শিউরে উঠলো তাকে দেখে।

: কে তুমি ?

: আমি পঞ্চানন।

পঞ্চানন, না পঞ্চাননের প্রেতাত্মা।—ঘণ্টাফটকের দেয়ালের ফাটল থেকে মুখ বাড়ায় বুঝি কৌতূহলী সরীসৃপের দল।—কোথা থেকে এল এই কিম্ভূত মানুষটা।

মানুষটা সোজা আসছে সেই বিবিগঞ্জ থেকে। বিবিগঞ্জের নদীর ধারে সেই যে ফরাসী কুঠিয়ালের কুঠি, তারি দরজা থেকে দৌড়ে আসছে পঞ্চানন। সেই কুঠির দোবের গোড়ায় নিজের পুত্রবধূর প্রাণহীন দেহটাকে ফেলে রেখেই ছুটে এসেছে সে।

বৃদ্ধ শ্বশুরকে ডেকেছিল কলঙ্কিনী পুত্রবধূ : প্রতিশোধ নেবে বাবা ? কাল এসো।

গেছলো পঞ্চানন। রাতের আঁধারে চুপিচুপি গা ঢাকা দিয়ে। দেখা হল না পুত্রবধূর সঙ্গে। পরদিন আবার গেল। হল না সাক্ষাৎ। আবার গেল পঞ্চানন। দেখা মিললো।

রক্ষিতের সিন্ধুকে ভুবনপুরের রায়েদের যত দলিল-পাটা বন্ধক দেওয়া ছিল, সব তুলে এনে দিলে হারাণের বৌ তার বৃদ্ধ শ্বশুরের হাতে। শুধু বললে : এগুলো তুমি নিয়ে যাও বাবা। নিয়ে পালিয়ে যাও। তারপর—

আর কোন কথা বলে নি হারাণের বৌ। হঠাৎ কেমন ঢলে পড়েছে তার বৃদ্ধ শ্বশুরের পায়ের ওপর। তারপর, একটু একটু কোরে নিবে এসেছে তার শরীরের উত্তাপ। মুখের দু'পাশে জমেছে ফেণা।—বিষের প্রতিক্রিয়া!

অকস্মাৎ কী যে ঘটে গেল, ঠিক কোরে তা যেন বুঝে ওঠবার অবসরও পেল না পঞ্চানন; তার আগেই কয়েকজনের পদশব্দ যেন শোনা গেল অদূরে। বন্ধকী দলিলের তাড়াটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে নিলে পঞ্চানন। তারপর, বাষ্পাকুল নয়নে তাকাল পুত্রবধূর নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে।

ফুলের মতো নিষ্পাপ সুন্দর কোমল একখানি মুখ। মুদিত নয়ন। ঠোঁটের কোণে হাসি। শান্তি পেয়েছে কি তবে হতভাগিনী?—কিন্তু নিজে বিষ না খেয়ে নেপালকে বিষ দিল না কেন?

পদশব্দ নিকটবর্তী হয়ে আসে। পুত্রবধূর প্রাণহীন দেহটাকে বিবিগঞ্জের সাহেবী কুঠির খিড়কির দোরে ফেলে রেখে পালাতে হয় পঞ্চাননকে।

তারপর সটান এই ঘণ্টাফটকে।

দর্প অনেকক্ষণ এই একান্ত শ্রীহীন ছন্নছাড়া মানুষটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললে: কি চাও আমার কাছে?

: চাই?—কিছু না, কিছু না। কার জন্যে চাইব? কে আছে আমার? কেউ নেই, কেউ নেই,—সব ফক্কা।

: এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় তবে কেন এসেছ এখানে?

: কেন?

শতছিন্ন কাঁথার আড়াল থেকে দলিলের তাড়াটা বের করে ফেলে দিলে পঞ্চানন দর্পর পায়ের সামনে। তারপর শুধু বললে : এগুলো দিতে এলাম।

: কি এগুলো ?

: রক্ষিতদের কাছে আপনাদের যত কিছু দেনার কাগজপত্তর। ঋণের যা কিছু প্রমাণ।

হাঁফাতে থাকে পঞ্চানন।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অনুভব করবার চেষ্টা করে দর্প।

পঞ্চানন জানায় সমস্ত ঘটনা। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথা,—সব ইতিহাস। বলতে বলতে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। তারপর হঠাৎ কান্নাটাকে থামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে : নেপাল রক্ষিত যখন ঢোল-সহরৎ করে দখল নিতে আসবে জমিদারীর, তখন বুক ফুলিয়ে জোর গলায় বলবেন,—কিসের দেনা ? কার দেনা ? কোন প্রমাণ আছে ?

দর্প অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পায়ের কাছে জড়ো হয়ে থাকা দলিলের গোছার দিকে। হাতের কাছে এসে গেছে আজ আবার তার সব কিছু। একটু হেঁট হয়ে হাত বাড়ালেই আবার এই মুহূর্তেই সব কিছু ফিরে আসতে পারে দর্পর জীবনে। খাসমহল, ঐশ্বর্য্য, আরাম,—সব কিছু।

বাইরের ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দর্পর মনের ভিতর ঝড় ওঠে।

পঞ্চানন রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করে।

ঘণ্টাফটকের ফাটলে ফাটলে মুখ বাড়ায় সরীসৃপের দল। তারাও বুঝি রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করে দর্পর মুখের পানে তাকিয়ে।

একবার একটু যেন হেঁট হয়ে হাতটাকেও বাড়ায় দর্প। আবার সিধে হয়ে দাঁড়ায়। তারপর অনুতপ্ত শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে: তা' হয় না পঞ্চানন।

: কেন?—আর্তনাদের মতো শোনায় পঞ্চাননের কণ্ঠ: কেন হয় না?

: ও যে আমার পূর্বপুরুষের দেনা—আমার বাবার দেনা। কাগজ পোড়ালেই কি আর সে-দেনা মেটে?

পঞ্চানন তবু অনুরোধ করে।

দলিলগুলো তবু লোভ দেখায়।

টিক্ টিক্ কোরে ফাটলের সরীসৃপগুলোও কী যেন অনুরোধ করবার চেষ্টা করে।

ঝড়টাও যেন অকস্মাৎ নিশ্চ,প হয়ে গিয়ে কান পাতে দর্পর মুখের শেষ কথাটুকু শোনবার জন্যে!

দর্প ঘাড় তুলে তাকায় দেয়ালের দিকে। রায়েদের চারপুরুষের পোর্টেটগুলো অন্ধকারে তুলে ওঠে। পঞ্চানন দর্পর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দলিলের গোছাটা তুলে দিতে যায় তার হাতে।

হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে দর্প: না, না, না! এ হতে পারে না, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না! এখনি চলে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। যাও, যাও, যাও!

দলিলের গোছা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় পঞ্চানন। দর্পর কণ্ঠস্বরে যেন অনন্তনারায়ণের তেজ! সেইমত দৃপ্ত ভঙ্গি দাঁড়াবার,—

তেমনি চোখের চাহনি,—তেমনি বুকের পাটা!—হ্যাঁ, ভুবনপুরের রায়ই বটে! প্রণাম করে পঞ্চানন আভূমি নত হয়ে।

কিন্তু, প্রতিশোধ?

পঞ্চাননের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার পুত্রবধূর ভূলুণ্ঠিত নিষ্প্রাণ দেহটা। সংকারটুকু পর্য্যন্ত হল না তার!

প্রতিশোধ নিতেই হবে পঞ্চাননকে। নিতেই হবে। নৈলে তার ছুটি নেই। মুক্তি নেই!

পঞ্চানন ফিরে যাবার পর আরো আধঘণ্টা কেটে গেছে। ঝড়ের মাতন বাড়ছে ক্রমেই। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশটা গর্জ্জে উঠছে বারবার। বৃষ্টির বেগটাই শুধু কিছু কম।

ঘণ্টাফটকের ফাটল বেয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে ভেতরে। পোর্টেট গুলো অসহায়ভাবে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ভাঙ্গা দেয়ালের ওপর। অসংখ্য কালো পিঁপড়ে তাদের সাদা ডিম মুখে নিয়ে সার বেঁধে এক ফাটল থেকে আর এক ফাটলে অনিশ্চিত আশ্রয় খুঁজতে ছুটেছে প্রাণের দায়ে।

শুধু নির্ব্বাক নিষ্পন্দ দর্প। পাথরের মূর্তির মতো এক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে তখন থেকে।

বৃন্দাবন ফিরে আসে এক সময়। দাঁড়ায় এসে সামনে। ভিজে গেছে সর্ব্বশরীর।

বেশ কিছুক্ষণ পর যেন মানুষটা নজরে পড়ে দর্পর।

: কোথায় গেছলি রে বেন্দা এই দুর্য্যোগে?

: বাঈমহলে।

বৃন্দাবন খামে মোড়া একটা চিঠি দর্পর হাতে এগিয়ে দিয়ে চলে যায় রান্নাঘরের খুপ্রির ভেতর। আলোটাকে অতিকষ্টে জ্বেলে চিঠির খাম খোলে দর্পনারায়ণ।

চিঠিটা এসেছে রতনবাঈ-এর কাছ থেকে—

"ছোট হুজুর,

তফাৎ হয়ে গেছ অনেক, তাই এই নামেই সম্বোধন করতে হচ্ছে আজ চিঠিতে। ঘণ্টাফটকে থাকো, কানের কাছেই তো ঢং-ঢং কোরে সাতটা বাজে; তখনো কি একবারো মনে পড়ে না আমার কথা? একজনের কিন্তু পড়ে। তার নাম নেপাল রক্ষিত। বেআদপ্টা দু-দিন এসেছে। শাসিয়ে গেছে, আজ আবার আসবে। তোমার অবিশ্যি কিই বা এসে যায় তাতে?

মনে পড়ে? তোমারই এক মেশোমশাই একবার মত্ত অবস্থায় ঢুকেছিলেন আমার পিসিমা পিয়ারাবাঈ-এর কাম্রায়? তোমার বাবা পায়ের নাগ্রা খুলে আগা-পাশ-তলা পিটিয়ে দূর কোরে দিয়েছিলেন তাঁকে। আর আজ?—কোথাকার কে এক নেপাল রক্ষিত এসেও অপমান করতে সাহস করে আমাকে! খাসমহল ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে বাঈমহলের প্রতি বংশানুক্রমিক দায়িত্বটাও তুমি এমন নির্বিকার চিত্তে ত্যাগ করতে পারলে দেখে সত্যিই খাতির করতে ইচ্ছে করছে তোমাকে।

আচ্ছা, সেই যে বছরখানেক আগে আমার পায়ে ছোট্ট একটা কাঁকড়া বিছে কামড়াতে শহর থেকে দু-দুজন সাহেব ডাক্তার এনে একটি যুবক ঘণ্টায় বত্রিশ বার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল,—'এখন কেমন বোধ করছো রত্না?'—সে কি সত্যিই তুমি?

যাক্, আজ আবার আসবে নেপাল রক্ষিত। রাত্ত দশটায় আমার চরম অপমানের জন্যেই হয়তো তৈরী হয়েই আসবে ও'। কিন্তু তাতে তোমার কি এসে যাবে বলো? রতনবাঈ-এর শুচিতা, সম্ভ্রম, চরিত্রের কী দাম আছে আজ আর তোমার কাছে?

এ ভালই হল। যে-ঘন্টাফটকের তলা দিয়ে একদিন আমরা এসেছিলাম হাতীর পিঠে মর্য্যাদার আসনে চড়ে,'—সেই ঘন্টা-ফটকের তলা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কলঙ্কের বোঝা নিয়ে চুপি চুপি মাথা হেঁট কোরে চলে যাবে বাঈমহলের শেষ-বাঈ রতন জয়পুরী। আর, ঘন্টাফটকের ওপর দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য দেখবে রায় বংশের শেষ রায়, কুমার দর্পনারায়ণ।......"

বাইরে থেকে ঝড়ের দম্‌কা হাওয়া এসে নিবিয়ে দিলে নিবু নিবু আলোটাকে। অন্ধকারে ঢেকে গেল সব। আর পড়া গেল না। সেই অন্ধকারে কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দর্প।

ঝড়ের ধাক্কায় দেয়ালে আছড়ে আছড়ে পড়ছে পোর্ট্রেটগুলো। অনেকদিনের অসংস্কৃত ঘন্টাফটক তার জীর্ণ দেহ দিয়ে আটকাতে পারছে না ঝড়কে। ফাটলের সরীসৃপগুলোর সাড়াশব্দ নেই। ভুবনপুরের রায়বংশের প্রথমা মহিষী মহামায়া দেবীর পোর্ট্রেটখানা ছিঁড়ে পড়লো মেঝেয়!

ওরই মধ্যে কিন্তু ঘন্টাফটকের ঘন্টা ঠিক বেজে চলে;—সাতটা আটটা, ন'টা। ঝড়ের দাপটে সে শব্দ কোথায় হারিয়ে যায়,—তবু বাজে ঠিক। দর্প তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারে।

ঢং ঢং ঢং ঢং······ !

রাত দশটা বাজলো। ঝড়ের সঙ্গে আবার সুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। এই রাতে গোটা ভুবনপুরকে যেন ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন প্রকৃতিদেবী।

বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠলো পশ্চিম দিকের সমস্ত আকাশখানাকে ছিঁড়ে। তারই আলোয় চকিতের জন্য দেখা গেল দর্পর চোখদুটো জলছে। হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছে বড় বন্দুকটা।

সস্‌-স্‌-স্‌-স্‌।

বাঈমহলের নাচঘরে শিষ্‌ দিয়ে উঠলো নেপাল রক্ষিতের হাতের সঙ্কর মাছের লম্বা চাবুকটা। অতিরিক্ত মদ্যপানে উন্মত্ত রক্ষিত। আঁৎকে উঠলো রতনবাঈ।

: অর্জ্জুন সিং!—ঝড়ের হাওয়ায় পাখীর পালখের মতো উড়ে গেল রত্নার ভীত কণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ।

: কোন সিংই আজ আর শিং নেড়ে তেড়ে আসবে না সুন্দরী,—আজ তোমার বাঈমহলের কেউ জেগে নেই। তাদের ঘুম কাল সকালের আগে ভাঙ্গবে না।—এই উপকারটুকুর জন্যে ঐ অর্জ্জুনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওকে ভাবছি আমার খাস্‌মহলের সেপাই করে নেব। কাজের লোক। তাই না?

: নিমকহারাম!—দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে রত্না।

মদের বোতল বার করে নেপাল রক্ষিত। স্খলিতপদে এগিয়ে আসতে চায়। জড়িতকণ্ঠে বলে: হবে নাকি প্রিয়ে? দু'চার ফোঁটা? ঠোঁটটা একটু নেবে নাকি ভিজিয়ে? টুকটুকে ঐ রাঙা ঠোঁট দুটি?

: খবরদার, কাছে এসো না বলছি।

হেসে ওঠে নেপাল: হা-হা-হা। হাঁড়ির সাপ, সেও ফোঁস্‌ করে রে!

: পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি তোমার, ছেড়ে দাও—

আবার হেসে ওঠে নেপাল: হা-হা-হা। ফোঁস্‌ ছেড়ে সাপ আবার কাঁদে যে রে!

নেপাল আরো এগোয়।

: ইতর, বেয়াদপ্, সাবধান।

: সাবধান!—হেসে ওঠে আবার নেপাল : ঠিক এই এক কথা, এক ভঙ্গি, এক দৃশ্য জীবনে যে কতবার দেখলুম প্রিয়ে। ওসব পুরোণো হয়ে গেছে। পারো তো নতুন কিছু ছাড়ো।

আত্মরক্ষার জন্য ছোট একখানা ছোরা বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছিল রম্ভা। ভেবেছিল, ব্যবহার করতে হবে না। তার আগেই ভগবান কোথা থেকে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটিয়ে দেবেন, যাতে কোরে লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে যাবে রতনবাঈ। কিন্তু কিছুই হল না।

বাধ্য হয়ে এবার সেই ছোরাটিকে ব্যবহার করলো রম্ভা। ছুঁড়ে মারলো নেপালের বুক লক্ষ্য কোরে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ছোরাটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপর।

এক পা এক পা কোরে কাছে এগিয়ে আসে নেপাল রক্ষিত। চোখে তার আগুন। হেসে ওঠে হা-হা কোরে। বীভৎস সে হাসি! চাবুকটা শিষ দিয়ে ওঠে আবার।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায় রম্ভা। দেয়ালের কোনে মিশিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আরো এগিয়ে আসে নেপাল। রম্ভার ওড়না তার হাতের মুঠোয়।

এক টানে ওড়নাটা খুলে নেয় নেপাল রম্ভার দেহের ওপর থেকে। তারপর সঙ্কর মাছের চাবুকটা বাগিয়ে ধরে।

হঠাৎ ঝড়ের হুঙ্কারের মধ্যেও গর্জ্জে ওঠে একটা বন্দুক।

নেপালের হাত থেকে খসে পড়ে চাবুক। অস্ফুট একটা আর্তনাদ কোরে এক হাতে কাঁধ চেপে ধোরে কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়ে নেপাল রক্ষিত। পড়বার আগে তাকায় একবার দরজার দিকে।

নাচঘরের দরজায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে দর্পনারায়ণ।

ছুটে এসে দর্পর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেয় রতনবাঈ। চীৎকার কোরে বলে: ওগো, এ কী করলে তুমি?—তুমি পালাও!

কিন্তু পালাবার জন্যে তো আসেনি আজ দর্প। মনের কাছ থেকে নিজেকে পালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সে অনেককাল। আর নয়। আজ সে তৈরী করে এসেছে নিজেকে। রত্নার সারা জীবনের সমস্ত ভার, সমস্ত দায়িত্ব দর্পর। সে দায়িত্ব দর্প আর কোনদিন এড়িয়ে যাবে না। দর্প ও রত্নার মাঝখানে কোন ফাঁকি নেই; কোন ফাঁকও তাই সে রাখবে না কিছুতেই। দর্প বললে—

: আজ আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি রত্না।

: কোথায়?

: আমার কাছে।

অত্যন্ত গভীর স্বরে এই দুটি কথা বলেই দর্পনারায়ণ রত্নার হাত ধোরে ছুটে বেরিয়ে যায় নাচঘর ছেড়ে!

নড়েচড়ে ওঠে নেপাল রক্ষিত। আঘাতটা গুরুতর নয়। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। কাঁধের মাংস ভেদ করেছে বন্দুকের গুলি। কোন রকমে হাতের ভরে একটুখানি উঠতেই নজরে

পড়ে একটা প্রেতমূর্তি দুহাতে নাচঘরের ওদিকের দোর আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

: কে! কে তুমি !!!

চীৎকার করে ওঠে নেপাল।

হা-হা-হা-হা-হা।

উন্মাদের মতো হেসে ওঠে পঞ্চানন।—প্রতিশোধ না নিয়ে তার যে ছুটি নেই এ-পৃথিবী থেকে। সাঁড়াশীর মতো হাতদুটো তার এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে নেপাল রক্ষিতের চোখের সামনে।

নেপাল রক্ষিত আর্তনাদ করে ওঠে।

*   *   *

গম্ভীর রাতে প্রচণ্ড একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায় ভুবনপুরের অধিবাসীদের। বুঝতে পারে না কেউ কিছু। একটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে সকলের বুক। ঘুমন্ত কচি ছেলেমেয়েগুলো আতঙ্কে মায়ের বুকের ভিতর গিয়ে লুকোয়। বৃদ্ধেরা ঠাকুর দেবতা স্মরণ করেন মনে মনে।

বাইরে তখন প্রলয় হচ্ছে!

পরদিন সকালে ভুবনপুরের সকলে সবিস্ময়ে দেখলে,—রায়েদের আভিজাত্য বংশমর্য্যাদা আর ঐশ্বর্য্যের প্রতীক সেই অনেক কালের ঘণ্টাফটকটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়েছে তার ইট-কাঠ-পাথরের টুকরো ভুবনপুরের সদর-সড়কের চারিদিকে। সেই ধ্বংস-স্তূপের একধারে পড়ে রয়েছে রায়বংশের প্রথমা মহিষী মহামায়া দেবীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৈলচিত্রটা!

সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বসে পঞ্চানন নামে যে পাগলটা হা-হা কোরে হেসে উঠছিল থেকে থেকে,—তার দিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন্ বোধ করেনি কেউ।

লোকে বললে, সুপ্রাচীন রায়বংশের পবিত্র কুলে কালি দিয়েছে দর্পনারায়ণ, তাই তো লজ্জায় আর অপমানে ঘণ্টাফটক নিজেকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছে। সামান্ত বাঈজীর জন্যে মানুষ খুন! ঘণ্টাফটক এতখানি কলঙ্ক সইতে পারে কখনো!

কিন্তু ঘণ্টাফটক যদি কথা বলতে পারতো, তাহলে তার চূর্ণবিচূর্ণ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে, তার ছড়িয়ে-পড়া প্রত্যেকটি ইট-কাঠ-পাথরের টুকরো দিয়ে সে উচ্চস্বরে হেসে উঠে বলতো,—“বড় আনন্দেই ভেঙ্গে পড়েছি আজ আমি। মহাভারতের সেই ভীষ্ম নামক ব্যক্তিটির মতোই এ যে আমার ইচ্ছামৃত্যু!”

ঘণ্টাফটকের সৃষ্টির সত্যিকারের ইতিহাসটা যারা জানতো, তারা আজ আর নেই। কিন্তু ঘণ্টাফটক নিজে তো জানে সব কথা।

কর্ণিকের আঘাতে আঘাতে যে গোপন ইতিহাস তার সর্ব্বাঙ্গে উৎকীর্ণ হয়ে ছিল এতদিন, আজ তা ভেঙ্গে ছড়িয়ে খালাস কোরে বেঁচেছে সে।

সে ইতিহাস কলঙ্কের।

রায়েদের ঐশ্বর্য্যের ইতিহাস কলঙ্কের।

রায়েদের রাজা হওয়ার ইতিহাস কলঙ্কের।

সে ইতিহাস শুনতে হলে কান পাততে হবে ঘণ্টাকর্ণকের ঐ ভূ-লুন্ঠিত প্রকাণ্ড অষ্টধাতুর ঘণ্টাটার বুকের ওপর। ঘণ্টার বুকের ওপর কান পাতলেই শোনা যাবে অনেকদিন আগেকার একটি করুণ কাহিনী।

সাধারণ ধনী ব্যবসাদার মাত্র তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ। খ্যাতি ছিল,—তাঁর অর্থের নয়,—তাঁর পত্নী মহামায়া দেবীর অপরূপ সৌন্দর্য্যের। রূপকথার কাহিনীর মতই ছড়িয়ে পড়ে ছিল তাঁর রূপের কথা, সারা ভুবন না হোক, ভুবনপুর জুড়ে।

কথাটা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাদারল্যাণ্ড সাহেবের কানে পৌছতেও দেরী হল না মোটেই। ভুবনপুরের অখ্যাত ব্যবসাদারের বাড়ীতে একদিন এসে হাজির হল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অশ্বযান। গাড়ী থেকে নামলেন স্বয়ং সাদারল্যাণ্ড সাহেব।

ঘণ্টাখানের পরে ফিরে গেল গাড়ী। হন্তদন্ত হয়ে দেবেন্দ্রনারায়ণ গেলেন বাড়ীর ভেতরে।

মহামায়া দেবী তখন দাসীর কাছে চুল বাঁধছেন। একরাশ চুল স্বপ্নের মত ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর গোলাপী পিঠের ওপর। ছোট্ট ছু বছরের ছেলেটি খেলা করছে অদূরে। দেবেন্দ্রনারায়ণ খানিকটা ইতস্তত: কোরে বললেন: চুল বাঁধা হয়ে গেলে ঘরে একবার এসো। কথা আছে।

কিন্তু একী অনাসৃষ্টি কথা! বাঙালীর ঘরের অসূর্য্যাম্পশ্যা বধূ যাবে সাহেবের মজলিসে!—না, না,—একথা উচ্চারণ করতে পারলেন কি কোরে দেবেন্দ্রনারায়ণ? ছিঃ!

দেবেন্দ্রনারায়ণ বললেন: দোষ কি! আহা, আমিও তো যাব তোমার সঙ্গে। ছুদিন পরে ওরাই তো হবে রাজা। মন জুগিয়ে চলতে পারলে ··

: তাই বলে আমি কেন?

: ওরা যে নিমন্ত্রণ করে গেল তোমাকে আর আমাকে। স্বয়ং সাদারল্যাণ্ড সাহেব নিজে এসে বলে গেলেন। আর আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণও করেছি যে!

: কিন্তু কেন গ্রহণ করলে তুমি? কি কোরে নিলে এ নিমন্ত্রণ?

: সাদারল্যাণ্ডের মেম-সাহেব আলাপ করতে চান তোমার সঙ্গে।

: তা' ওঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করলেই তো পারতে।

: তাই না হয় করবো ভবিষ্যতে। কিন্তু···

: কিন্তু কি?

: শুধু তোমারই অনারে, মানে তোমারই সম্মানে ওঁরা মজলিসের আয়োজন করেছেন ওঁদের কুঠিতে। অনেক বড় বড় ইংরেজ আসবে, ফরাসী সাহেবেরাও আসবে। না গেলে বড্ড খারাপ হবে দেখতে। তাছাড়া, তোমার এই নিমন্ত্রণ-গ্রহণের কথা যাতে বাইরের কেউ কোনদিন জানতে না পারে, সে ব্যবস্থাও আমি করতে বলে দিয়েছি সাদারল্যাণ্ড সাহেবকে।

পুরো দুটো দিন ক্রমাগত তর্ক-বিতর্ক অনুনয়-বিনয় কোরে রাজি করালেন দেবেন্দ্রনারায়ণ মহামায়া দেবীকে। তারপর যথাদিনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে এসে দাঁড়াল দেবেন্দ্রনারায়ণের পর্দ্দা-ঢাকা অশ্বযান।

সাদারল্যাণ্ড নিজে এসে হেঁট হয়ে নামালেন মহামায়া দেবীকে। বেজে উঠলো বিলিতি বাজনার সুর মহামায়া দেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই।

প্রথমেই মজলিসের ভিড়ে নিয়ে গেলে পাছে তিনি কষ্ট পান,

তাই সাদারল্যাণ্ড সাহেব মহামায়া দেবীকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

তারপর ?

তারপরের ইতিহাসে শুধু এইটুকুই জানা যায় যে, সে রাত্রে রায়েদের অশ্বযান আবার পর্দ্দা ঢাকা দিয়েই ফিরে এসেছিল বটে,—কিন্তু তার ভিতরে ছিলেন শুধু একটি প্রাণী। নাম তাঁর দেবেন্দ্রনারায়ণ।

মহামায়া দেবী ফিরেছিলেন তার পরদিন। সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছেন তখন তিনি। তারপর বেঁচে ছিলেন মাত্র দু'দিন। তৃতীয় দিন শয়নকক্ষের টানা-পাখাটার সঙ্গে বিয়ের দিনের বেনারসী শাড়ীর বাঁধনে ঝুলতে দেখা গেল তাঁকে।

সেই দিনই ভুবনপুরের অধিবাসীরা প্রথম দেখতে পেলে রায়েদের অপরূপা সুন্দরী বধুকে। একরাশ সিঁদুরে কপাল তাঁর লাল, একরাশ আলতায় গৌর চরণ দুটি তাঁর রাঙা। গলায় ফুলের মালা। ঘুমিয়ে আছেন প্রকাণ্ড পালঙ্কের মাঝখানে ফুলের মতো।

তারপর ?

তারপরের কাহিনীতে যদি শোনা যেত যে, সেই নরপিশাচ সাদারল্যাণ্ড কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেল, এবং দেবেন্দ্রনারায়ণ দুঃখে শোকে ঘৃণায় সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গেলেন, তাহলে চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারার উদয়াস্তের নিয়ামক বিধাতাপুরুষের নির্ভুল, নিখুঁত ব্যবস্থার প্রমাণ পেয়ে দুহাত তুলে

তাঁর জয়গান করা যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংসারটা কোনদিনই নীতিগল্প বা ব্রতকথার কাহিনীর সিধে পথ ধরে চলে না। যা হওয়া উচিত তা হয় না ; যা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তাই হয়।

দেবেন্দ্রনারায়ণ বিবাগী হননি। সাদারল্যাণ্ডের কুষ্ঠব্যাধি হয়নি মোটেই।

দেবেন্দ্রনারায়ণের জন্যে রাজা খেতাবটা সাদারল্যাণ্ড সাহেবই সুপারিশ কোরে দিয়েছিলেন আনিয়ে। তাঁরই বদান্যতায় ভুবনপুরের রায়বাড়ী রাজত্বের ঐশ্বর্য্যে ঝল্‌মলিয়ে উঠেছিল। তৈরী হয়েছিল খাস্‌মহল, তৈরী হয়েছিল বাঈমহল, আর ভুবনপুরের সদর চৌরাস্তায় গড়ে উঠেছিল ঘণ্টাফটক।

রায়বংশের সেই কলঙ্কের বোঝা, সেই পাপের ভার আজ খালাস কোরে গেল দর্পনারায়ণ, রতনবাঈ এর ইজ্জৎ বাঁচিয়ে। তাই.তো নিজেকে ঝড়ের মুখে চুরমার কোরে ছড়িয়ে দিয়ে ঘণ্টাফটকের আজ এত আনন্দ!

...

ঘণ্টাফটকের সেই অপরিসীম আনন্দের অট্টহাসিই যেন ধ্বনিত হয়ে ওঠে উন্মাদ পঞ্চাননের কণ্ঠে। প্রখর রৌদ্রেও অম্লানবদনে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়ায় পঞ্চানন ঘণ্টাফটকের ধ্বংসস্তূপের ওপর ; আর কেবল হাসে,—হা হা হা।
